অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

মে, ১৯৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

মে, ১৯৬১

প্রকাশ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

ছেপেছেন

সুশীলকুমার ঘোষ

মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস

১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন

সমীর রায়চৌধুরী

দু-টাকা

কী করে কী হয়ে গেল যেন ধরতে ছুঁতে পেলুম না। বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁসা মফস্বল সহরের স্কুল, টিফিনের ঘণ্টা দিয়েছে। ভাঙন-নদীতে ভরদুপুরে ভরা কোটালের বান ডাকবে, চল যাই দেখে আসি সেই ঢেউয়ের হাত পা-ছোঁড়া। দূর থেকে মনে হবে যেন একখানা চাদর উড়ে আসছে, কিংবা একটা মশারি; কিন্তু পলক ফেলতে-না-ফেলতেই সব চাদর মশারি ফর্দাফাঁই। কত নৌকো টালমাটাল, কত-কত মাটির চাঙড় জলসই। আর হাওয়া কী, যেন সবাইকে ছন্নছাড়া করে দেবে। এদিকে অনেকটা রাস্তা, ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে যাবে যে! এ-ওর মুখের দিকে তাকাই, নদীর গর্জনে কে শোনে ইস্কুলের ঘণ্টা! জল মাঠ আকাশের দেশে কে শোনে বদ্ধ ঘরের আর্তনাদ!

তারপর কোথায় সেই নদী, সেই রঙ্গিনী ভুজঙ্গিনী! একি, একটা বিশাল ঘরের মধ্যে এসে ট্রেন ঢুকল! এই বুঝি রহস্যপুরী কলকাতা! এত কোলাহল-গুঞ্জিত হয়েও সে পাষাণ-স্তব্ধ। সেই রহস্যপুরীর সবচেয়ে আশ্চর্য কক্ষ বুঝি হ্যারিসন রোডের তখনকার সেই এম. সি. সরকারের দোকান! কলেজে পড়ি আর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবি, ঐ ঘরের চৌকাট বুঝি একজন্মের পথ, আর ঐ যে আনন্দের মৌচাক, সে বুঝি শুধু দেবতাদের নাগালে। কোথা দিয়ে কী হল যেন ধরতে-ছুঁতে পেলুম না। সুধীরবাবু, সাহিত্যের বিষয়ে-ব্যাপারে যাঁর মত সুজন যাঁর মত সহৃদয় আর দ্বিতীয় কেউ নেই, পথের লোককে কাছে টেনে পাশে এনে বসালেন, মুহূর্তে মুখর করে তুললেন, অজস্র করে তুললেন। অন্তরে যে চিরন্তন শিশুটি বাস করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন।

সেই থেকে আজও শিশুর চোখে জগৎকে দেখা হল না। শেষ হল না একটি শিশু-খেলুড়ের সঙ্গে সাহিত্যের খেলাধুলো।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

এই সিরিজে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত * আশাপূর্ণা দেবী * জরাসন্ধ * নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় * বনফুল * বুদ্ধদেব বসু * মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় * শিবরাম চক্রবর্তী * সুকুমার দে সরকার * কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় * তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় * প্রেমেন্দ্র মিত্র * বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় * মৌমাছি * মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় * শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় * হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রতি বই দু-টাকা

টুটু, টিপু, নিপু,

সান্নু, রঙ্গন

ও

কুশলকুমারকে

কবি-সম্বর্ধনা

রামবাবু একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক। তোমরা না জানলেও তোমাদের দাদারা তাঁর নাম জানে। আর যদি কোনদিন মোহন-বাগানের ম্যাচ দেখতে গিয়ে থাকো তো তাঁকে তোমরা সেণ্টার ফ্ল্যাগের কাছে গ্যালারির সবচেয়ে নিচের ধাপে দেখে থাকবে। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু দেখতে একটি আস্ত গণ্ডার। যেমন থলথলে মোটা ভুঁড়ি তেমনি গাছের গুড়ির মত হাত-পা। তার ওপর ঘাড় নেই বললেই চলে—মাথাটা টাইম-পীস ঘড়ির মত এই একটুখানি—স্ক্রুর মত ঘাড়ের ওপর এঁটে বসেছে। তবু তো মাঠে তাঁকে তোমরা জামা গায়ে দেখে থাকবে, কিন্তু মোহনবাগানের গুঁফোদা যেদিন ডারহামস্‌কে গোল দিল, সেদিন গায়ের জামা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে তাঁর সেই প্রলয়-নৃত্য দেখনি? ও হরি! যেমনই জামা তাঁর ছিঁড়ে ফেলা, অমনি নৃত্যের প্রাবল্যে তাঁর ভুঁড়ির খাঁজ থেকে পয়সা, আনি, বিড়ি ও দেশলায়ের কাঠি টপাটপ ঝরে পড়তে লাগল। ঐ ভুঁড়িটি তাঁর পৈতৃক মনি-ব্যাগ। পকেট-কাটারা কোনকালেই ঐ বিরাট গোলক-ধাঁধার সন্ধান পাবে না।

চেহারা দেখেই যদি নাক সিঁটকোও তবে তোমাদের তারিফ করতে পারব না, কেননা, পড়নি সেই কথাটা···যা-কিছু ঝকঝক করে সব সোনা নয়? রামবাবু একজন মস্ত কবি, কে জানে হয়ত একদিন তাঁরই পদ্য তোমাদের মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করতে হবে। এখন নাহয় তাঁর নাম হয়নি, কিন্তু কবিদের সুখ্যাতি নাকি তাঁদের মৃত্যুর পরেই হয়ে থাকে। অতএব রামবাবুরও সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। নাম একদম কিছু হয়নি, তাই বা বলি কী করে? বাড়িতে

স্ত্রী নাহয় উঠতে-বসতে মুখ-ঝামটা দেয়, কবিতার খাতায় আগুন করে দুধ গরম করে, কিন্তু হীরুকে জানো তো? কাঁসারিপাড়ার সেই হীরু? মিত্র ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে সাত বছর যে বসে আছে? বা, হীরুকে জানো না? আমি আর কী বলব—তোমাদের দাদাদের জিজ্ঞেস কোরো—তাঁদের কেউ নিশ্চয় তার সঙ্গে পড়েছেন। সেই হীরু রামবাবুর একজন প্রধান ভক্ত—লাইনের সঙ্গে লাইন মিলিয়ে সেও রামবাবুর মত আকাশে উড়তে চায়। রামবাবুর জন্যে ম্যাচে গ্যালারিতে জায়গা রাখে—এবং তাঁর জন্যে জায়গা রাখার অর্থ, হীরুকে তক্তার ফালিটার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তবু অত বড় কবি তার পাশে বসবে—সেইটেই হীরুর অহঙ্কার! খেলার মাঠে রামবাবু যে চিনেবাদাম খান তার খোসাগুলি হীরু সযত্নে কুড়িয়ে রাখে—কে জানে, হয়ত একদিন এই স্মৃতিচিহ্নগুলির ভয়ানক দাম হবে—হীরুকে কষ্ট করে আর ম্যাট্রিক পাশ করতে হবে না।

একদিন অতি কাঁচুমাচু হয়ে হীরু রামবাবুকে বললে, আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি একদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে চা খাবার কথা বলে দিলেন। গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন না দয়া করে? কথাটা বলি-বলি করেও এতদিন বলতে পারছিলাম না, আপনার সময়ের তো কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। তবু যদি—

রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার দাদা?

চোখ কপালে তুলে হীরু বললে, বা, দাদাকে চেনেন না? তিনি একজন মস্ত সমালোচক - আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লোকে আপনাকে এখনো ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু দাদা বলেন, আপনি রবিঠাকুরের চেয়েও এক হিসেবে বড় কবি।

রামবাবু গলে গিয়ে বললেন, সেই কথাটা দেয়ালে প্ল্যাকার্ড মেরে মেরে তোমার দাদাকে রটিয়ে দিতে বল না! যাব একদিন। এমন গুণীর সঙ্গে দেখা না করে পারি? কালকেই যাবখন—কী বল?

খুশিতে গদগদ হয়ে দুহাত কচলাতে কচলাতে হীরু বললে, আপনার দয়া! কাল ম্যাচ নেই—ধরুন এই ছটার সময়। আমি জগুবাজারের স্টপে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি আসবেন শুনলে আমাদের পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। যাবেন দয়া করে। গণ্যমান্য আরো দু-পাঁচজনকে ডাকা হবেখন।

আনন্দে দিশেহারা হয়ে রামবাবু বাড়ি ফিরলেন।

এই তাঁর প্রথম প্রকাশ্য সম্বর্ধনা হচ্ছে। শুধু ফাঁকা স্তুতিবাদ নয়, দস্তুরমত একপেট ভোজন! বিলিতি কায়দায় একেবারে চায়ের টেবিলে নেমন্তন্ন! খবরটা কাল আনন্দবাজার পত্রিকায় বের করতে হবে।

পরদিন বিকেলে তাঁর সাজ-গোজের বিরাট আয়োজন দেখে রামবাবুর স্ত্রী বললে, এত সেজে-গুজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রামবাবু এসেন্সের শিশির মধ্যে কর্কটা ডুবিয়ে নিয়ে গোঁফের ওপর বারে বারে ঘসছেন। বললেন, দেখ তো নাপ্‌তে ব্যাটা ঘাড়টা কেমন চেঁচেছে!

মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনতে পাই?

—আর বোলো না, তোমরা তো কবির সম্মান করতে শিখলে না, কিন্তু তাই বলে বাংলা দেশের সব পাঠক তো তোমাদের মত মূর্খ নয়, তারা আমায় বুঝতে শিখেছে। জানলা দরজা ভেজিয়ে কতকাল আর সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখা যায় বল?

স্ত্রী বললে, তা তো বুঝলাম, কিন্তু রাত্রে আজ মাংস রাঁধব ভেবেছি—সকাল-সকাল ফিরবে, বুঝলে?

দুত্তোর তোমার মাংস! রামবাবু ধমকে উঠলেন, এদিকে আমার চায়ের নেমন্তন্ন, আর উনি যাচ্ছেন মাংস রাঁধতে! পৃথিবীর কোন খবর তো আর রাখো না। আমার ভক্তরা মিলে আমাকে আজ অভিনন্দন দিচ্ছে। অভিনন্দন মানে জানো? বানান কর দেখি? হ্যাঁ, তোমাকে বোঝাতে গেলেই হয়েছে!

অত কথা শুনতে চাই না। রাত্রে কোথা থেকে যেন খেয়ে এসো না।

খেয়ে আসব না মানে? রামবাবু একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। আমার কিনা চায়ের নেমন্তন্ন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাত্র একবাটি চা নয়, কেক, পেসস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচ, ক্রীমরোল, ক্রীমক্র্যাকার—নাম শুনেছ কোন-কালে? রাত্রে আমি কিছু খাব না, বুঝলে? মার্বল-টপ টেবিলে বসে খাওয়া—তোমায় তার কী বোঝাব?

রামবাবু ভবানীপুরের বাস ধরলেন।

কিন্তু জগুবাবুর বাজারের কাছে নেমে হীরুকে কোথাও দেখা গেল না। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আরো খানিকক্ষণ দাঁড়ানো যাক। লোকজন জোগাড় করা, গ্যাস জ্বালানো, খাবার-দাবার ফরমাস করা—সব তো একা করতে হচ্ছে। একটা কোন গাড়ি বা না ঠিক করতে হয়। রামবাবু গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঐ, ঐ আসছে হীরু। ও নতুন কবি হচ্ছে কিনা, তাই সময় সম্বন্ধে ঠিক ধারণা নেই। রামবাবুর কাছে এসে হীরু বললে, এই নামলেন বুঝি বাস থেকে? আসুন, আসুন,—বাস যা থেমে-থেমে চলে!

রামবাবু বললেন, কিন্তু এখন টি-টাইম ছেড়ে যে প্রায় ডিনার-টাইম হয়ে গেল!

হীরু হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, হেঁ হেঁ,—তাতে কী? চলুন।

প্রকাণ্ড বাড়ি—হীরুরা বনেদী বড়লোক। কিন্তু দরজায় না ঝুলছে আমপাতার মালা, না দেখা গেল কলাগাছ পোঁতা। লোকজনের সাড়া-শব্দ নেই। কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। উদ্বিগ্ন হয়ে রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ এখনো আসেননি বুঝি?

হীরু বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে, দাদা সবাইকে বারণ করে দিলেন। বললেন, কবির সঙ্গে আলোচনায় বাজে লোকের ভিড় বাড়িয়ে কাজ নেই।

মুখখানা হাঁড়ি করে রামবাবু হীরুর সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে একটা

ঘরে ঢুকলেন। ছোট, নোংরা ঘর—কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা —মেঝের ওপর ফরাস পেতে খালি গায়ে একটা লোক বসে আছে। লোকটার কোলের কাছে একটা জলচৌকি—তাতে সে একটা কাগজ পেতে কি জানি কী সব লিখে চলেছে। বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। রামবাবু ঘরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড ছায়া পড়ে ছোট ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। লোকটা চোখ তুলে তাকালো। হীরু পরিচয় করিয়ে দিলে—দাদা, ইনি হচ্ছেন রামবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

হীরুর দাদা গায়ের ওপর কোঁচার খুঁটটা জড়াতে-জড়াতে বললে, বসুন, বসুন। যা হীরু, শিগগির যা, ঠাকুরকে জল চাপাতে বলে দিয়ে আয়।

হীরু বাড়ির ভেতর চলে গেল, আর রামবাবু জড়সড় হয়ে মেঝের ওপরই বসে পড়লেন। নিরাশ হয়ে লাভ নেই; ভক্তের দল না-ই বা এল, তবু পেটপুজোই বা এ দুর্দিনে কজনে করাতে চায়! তাই মুখে হাসি টেনে রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখছেন?…আমার কবিতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাকি?

কাগজটা তাড়াতাড়ি উল্টে রেখে হীরুর দাদা বললে, না না, একটা সাবস্ট্যান্স লিখছি। পরীক্ষা এসে পড়েছে।

পরীক্ষা! পরীক্ষা কিসের?

আর বলেন কেন? ম্যাট্রিকটাই এই বছর-আষ্টেক ফেল মারছি। এই যে, হীরু এসেছিস। জলের কদ্দুর?

হীরু বললে,—বৌদি ধমকে দিলে, বললে, উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি বারে বারে নামানো যাবে না।

হীরুর দাদা বললে, আচ্ছা আচ্ছা, উনি নাহয় একটু বসছেন। কী বলেন, এক পেয়ালা চা খেয়ে গেলে আর ক্ষতি কী? নতুন আর কী লিখলেন?…দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমি একটা দীর্ঘ সমালোচনা লিখব।

রামবাবু উৎসুক হয়ে বললেন, কী নিয়ে? আমার কবিতা, না গল্প?

ও-সব বাজে আলোচনা। আমি লিখব আপনার নাম নিয়ে। আপনার সমস্ত মাহাত্ম্য ঐ নামে। আপনি যে সবায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা আপনার নামেই বোঝা যাচ্ছে।

আমার নামে! রামবাবু বিস্ময়ে হাঁ করে রইলেন।

হীরুর দাদা বলতে লাগল, এই দেখুন না—ছাগলের মধ্যে হচ্ছে রামছাগল, পাখির মধ্যে রামপাখি, দা-র মধ্যে রামদা,—তেমনি কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আপনি রামকবি। কী, সত্যি কি না?

রামবাবুর চক্ষুস্থির! হীরু কতক্ষণে খাবারের থালাটা নিয়ে আসে (কেননা নিতান্ত দেশি মতে তাঁর অভ্যর্থনা হচ্ছে) তারই আশায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

হীরু এসে বসল। রামবাবু বললেন, রাত হয়ে যাচ্ছে, হীরু।

মুখের কথাটা লুফে নিয়ে হীরুর দাদা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওঁকে বসিয়ে রেখো না। উনি তো আর তোমার মত ভবঘুরে নন, সময়ের ওঁর দস্তুরমত দাম আছে। এতক্ষণে দু-চারটে কবিতা গজিয়ে যেত, কী বলেন?

হীরু বললে, বা, আর-একটু বসুন, চা আসছে।

চা আসছে! আঃ! রামবাবু কোমরের কসিটা নামিয়ে ভুঁড়িটাকে একটু আলগা দিলেন।

কিন্তু উড়ে চাকরের হাতে নেহাতই একপেয়ালা চা মাত্র। তার পেছনে বহুদূর পর্যন্ত আর কাউকে দেখা গেল না।

হীরু গর্জে উঠল, কী রে, চায়ে দুধ দিসনি একেবারে? দে, আমার হাতে দে। বলে কাপটা চাকরের হাত থেকে তুলে নিয়ে হীরু ফের ভেতরে চলে গেল। হীরু যখন গেছে, তখন অমনি শুধুহাতে আর আসবে না নিশ্চয়ই!

হীরুর দাদা কাগজটা রামবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,

আপনি তো এত সব লেখেন, দয়া করে আমার এই সাবস্ট্যান্সটা লিখে দিন না! দাঁত ফোটায় কার সাধ্যি! এক্ষুনি আবার মাস্টারমশাই এসে পড়বে।

এত বড় ধাড়ির আবার মাস্টার! রামবাবু বললেন, আমার এখন সময় হবে না।

হীরুর দাদা বললে, তা যা বলেছেন। মিছিমিছি হীরু আপনাকে অমনি বসিয়ে রেখেছে কেন? চায়ে দুধ একটু কম হলে কী হয়?

রামবাবু গুম হয়ে তবু বসে রইলেন। যাক, ঐ হীরু আসছে। কিন্তু পেছনে আর কেউ নেই তো! দু-দুবার যাওয়া-আসা করার ফলে পেয়ালার চাও অর্ধেক হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, কালো চা, ওপরে ছাঁকা ছাঁকা কতগুলি সর ভাসছে।

চায়ে নাকি ক্ষিদে নষ্ট হয়, সেই ভরসায় রামবাবু এক চুমুকে তলানি-সুদ্ধু পেয়ালাটা সাবাড় করে ফেললেন। হীরুর দাদা হীরুকে বললে, কী রে তুই! ভদ্রলোক এল—এত বড় নামজাদা রামলেখক, তাকে কিছু খাবার পর্যন্ত খাওয়ালি না? ··তা, বাজারের বাজে খাবারে খালি পেট-খারাপ করে। নিন, আমার এই পান নিন। মিঠে পান, আস্ত একটি এলাচ দিয়ে সাজা। বলে হীরুর দাদা ট্যাক থেকে ডিবে বার করে খুলে একরত্তি একটি পান রামবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

পানটি মুখে পুরতেই হীরুর দাদা হীরুকে বললে, ওঁকে তুই কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি! এতে তুই বাংলা সাহিত্যের কী ক্ষতি করছিস কিছু খেয়াল আছে?

হীরু রামবাবুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, যে চায়ের পেয়ালায় আপনি আজ চুমুক দিলেন সেটা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখব।

রামবাবু বললেন, শুধু-শুধু এত টাকা খরচ করবে কেন! তা দিয়ে বরং আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কোরো। বলে তিনি বেরিয়ে

পড়লেন। কিন্তু উদরে তখন আগুন জ্বলছে। ঐ আধ কাপ চা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এখন তিনি কী করেন? বাড়ি ফিরে এখন খেতে চাইলে তাঁর সমস্ত কবি-সম্মান মাঠে মারা যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবেন না।

হায়! বাড়িতে আজ মাংস হচ্ছিল, ঘ্রাণে সমস্ত ঘরবাড়ি আমোদিত হয়ে আছে! বাটিতে-বাটিতে সবাই হয়ত কত ফেলে-ছড়িয়ে খাচ্ছে! থালার ধারে ধারে চিবোনো হাড়ের পাহাড় উঠে গেল। আর তাঁর ভাগ্যে কিনা আধ কাপ কেলে-কুষ্টি, তেতো চা!

রামবাবু দিগ্বিদিক না তাকিয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়লেন। প্রকাণ্ড ঠোঙা সাজিয়ে রাজ্যের খাবার নিয়ে তিনি গিলতে শুরু কবলেন। কিন্তু দাম দেবার সময় পকেট হাতড়ে—য়্যাঁ! মনি-ব্যাগ! মনি-ব্যাগ কোথায়? ভদ্রলোক সাজতে গিয়ে টাকা-পয়সা যে চামড়ার থলিতে করে পকেটে রেখেছিলেন! সর্বনাশ! এখন কী হবে! চায়ের কাপ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার জন্যে আলগোছে হীরু হয়ত সেটা তুলে নিয়েছে! দোকানদাররা সব তাঁকে জাপটে ধরলে, বললে, খেয়ে দাম না-দিয়ে ঠকাবার মৎলব! পুলিশ ডাকব এখুনি!

রামবাবু বললেন, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না। আমি আড়াইটে টাকা নিয়ে পালাব না।

পালাবে না? তবে হাতের ঐ আংটি, শার্টের ঐ বোতাম রেখে যাও। অমন ঢের জোচ্চোর আমরা দেখেছি।

অতএব ঐসব দামি আংটি আর বোতাম দিয়ে রামবাবু ছাড়া পেলেন।

বাড়ি ফিরলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, কী হল?

রামবাবু বললেন, জোয়ানের আরকের শিশিটা শিগগির দাও তো! যা একগাদা খাইয়ে দিয়েছে—মাংস, চপ, পোলাও—অতশত কি নাম

জানি। রাজ্যের খাতায় নিজের নাম দস্তখত করতে-করতে আঙুল-গুলো ব্যথা হয়ে গেছে। বলে রামবাবু আঙুল মটকাতে লাগলেন।

অ্যাঁ, তোমার আংটি কোথায়?

রামবাবু হেসে বললেন, আমার এক ভক্ত এক নাগাড়ে আমার কবিতা এত মুখস্থ বলতে লাগল যে তাকে ওটা প্রাইজ দিয়ে ফেলেছি। নইলে যে মান থাকে না! তবে, ছেলেমানুষ ভক্ত, কাল ভাবছি গোটা-আড়াই টাকা দিয়ে ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। কী বল?

আর দিয়েছে!

রামবাবু বললেন, না দিল তো বয়ে গেল! ভারি তো একটা আংটি! যা সম্মান আজ পেলাম, পৃথিবীর কোন অর্থভাণ্ডারে তার উপযুক্ত দাম নেই। বলে তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন।

জন্মান্তর

এক

প্রায় মোটরের তলায় পড়ে যাচ্ছিল আর-কি! চক্ষুর সূক্ষ্মতম পলকপাতের মধ্যে শচীনবাবু গাড়ি থামালেন।

আট-দশ বছরের একটি সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন ছেলে। এখুনি ছিঁড়ে খসে তালগোল পাকিয়ে খানিকটা রক্ত আর খানিকটা মাংসে পর্যবসিত হতে যাচ্ছিল। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।

শচীনবাবু তাকে ধমকাতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন ছেলেটি কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। আকস্মিক বিপদের থেকে আরো আকস্মিক রক্ষা পাওয়ার মধ্যেও একটা আঘাত আছে। শচীনবাবু বুঝলেন, তেমনি আঘাতের জন্যেই ছেলেটি কেমন অসাড়।

শচীনবাবু দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিলেন, নিজের বাঁ পাশে। দেখলেন, কেমন সাদাটে ফ্যাকাশে মুখ, কেমন ভয়-পাওয়া অসহায় চাহনি। শচীনবাবু গাড়িতে স্টার্ট দিতে-দিতে বললেন, ভয় নেই, কোথাও তোমার কিছু লাগেনি।

ছেলেটি যেন বিশ্বাস করতে চাইল না।

শচীনবাবু বললেন, বল, তোমাকে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে। তোমার বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি নিরুত্তর।

শচীনবাবু বললেন, কী, গাড়িতে বসে বাড়ির ঠিক ঠাহর হচ্ছে না বুঝি? বেশ, ঠিকানা বল। শচীনবাবু তাকালেন তার মুখের দিকে। সে মুখে তখনো একটা নির্বাক ভয়, দুই চোখে বিবর্ণ কাতরতা।

তোমার নাম কী?

ছেলেটি কেমন গুঙিয়ে অথচ অস্বাভাবিক শব্দ করে হেসে উঠল।

—নিজের নামটাও জানো না? শচীনবাবু বিরক্ত হলেন, কোন্ ক্লাসে পড়? কোন্ ইস্কুলে?

উত্তরে রাস্তার দিকে মুখ করে ছেলেটি বসে রইল চুপ করে।

আজকালকার দিনে এমন ইডিয়ট ছেলের কথা তো কখনো ভাবা যায় না! শচীনবাবু রাগ করে উঠলেন। বললেন, তোমার বাবার নাম কী? হেডমাস্টারের নাম কী? ছেলেটি এবার উৎসাহিত হয়ে দীর্ঘ উত্তর দিলে, অস্ফুট বিকৃত শব্দে, অর্থহীন অঙ্গভঙ্গিতে।

শচীনবাবু বুঝলেন, ছেলেটি হাবা।

হঠাৎ কলকাতা শহরটা তাঁর কাছে প্রকাণ্ড মরুভূমি মনে হল, কোথাও পথ খুঁজে পেলেন না। একে নিয়ে কী করেন, কোথায় যান, কিছুই তিনি কিনারা করতে পারলেন না। রাস্তা থেকে রাস্তায় তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কলকাতার চেহারা দেখে কিছুতেই তাঁর মনে হল না কারুর কোন ছেলে হারিয়েছে। একবার ভাবলেন, থানায় দিয়ে আসি। কিন্তু বেলা তখন প্রায় এগারোটা, কখনই বা ছেলেটা স্নান করে, কখনই বা দুটি খেতে পায় কিছু ঠিক নেই। অতএব সটান বাড়ি চলে যাওয়াই প্রশস্ত।

—দেখ কী এনেছি। বাড়ি এসে শচীনবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন।

শচীনবাবুর স্ত্রী ইন্দুমতী বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন, ছোট্ট ফুটফুটে একটি ছেলে। পরনে খাকির হাফপ্যান্ট, গায়ে টুইলের হাফশার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল—ছেলেটি বড়-বড় চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

—কাদের ছেলে? ইন্দুমতী কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—জিজ্ঞেস করে দেখ।

ইন্দুমতী ছেলেটিকে কাছে টেনে এনে বললেন, তোমার নাম কী?

—বু-বু-বু—ছেলেটির চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল।

—এ কী সর্বনাশ! ইন্দুমতী পিছিয়ে গেলেন, এ যে দেখছি হাবা! একে পেলে কোথায়?

—প্রায় মোটরের তলায় বলতে পার, শচীনবাবু বললেন,—এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়েছে।

—সঙ্গে এর কেউ ছিল না?

—না, বাড়ি থেকে কোন্ ফাঁকে একা বেরিয়ে পড়েছে হয়ত।

—কিন্তু একে ফের পৌঁছে দেবে কী করে?—ইন্দুমতী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বললেন, বাপ-মা কত ভাবছে বল দেখি! বলে ছেলেটিকে তিনি নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন। বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না, খোকা?

ছেলেটি শীর্ণ, বিবর্ণ মুখে আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল।

ইন্দুমতী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, রাস্তায় ছেড়ে দিলে, বলা যায় না, পথ চিনে-চিনে বাড়িতে ও ঠিক চলে যেতে পারবে হয়ত। বলতে না পারলে কী হয়, বুঝতে পারে হয়ত।

ছেলেটি হয়ত বুঝল কথার অর্থ তার অস্পষ্ট চেতনায়। কে যেন তাকে হঠাৎ তাড়া করেছে, ভূত কিংবা ডাকাত, এমনি ভয় পেয়ে ছেলেটি ইন্দুমতীকে আঁকড়ে ধরে বিকৃত গলায় আর্তনাদ করে উঠল। যতক্ষণ না ইন্দুমতী তাকে দুই হাতের মধ্যে আবৃত করে নিয়েছেন, ততক্ষণ।

দেখা গেল, বলতে যেমন বুঝতেও সে তেমনি। কলতলায় তাকে স্নান করতে পাঠিয়ে বিপদ, সোজা চৌবাচ্চার জলে সে ডুব দিয়েছে; খেতে বসিয়ে বিপদ, এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রছান। দোতলায় বিছানা করে শুতে দেয়া হল, দেখা গেল কোত্থেকে একটা টুল জোগাড় করে তাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে সে দেয়ালে ম্যাপ আঁকছে।

বুঝতে দেরি হল না, ছেলেটা পাগল।

ইন্দুমতী হাঁপিয়ে উঠলেন, এখন কী করা!

শচীনবাবু বললেন, থানায় একটা খবর দিয়ে আসি।

থানায় খবর দেয়া হল। কিন্তু কোথায় কার ছেলে—তিন দিনেও কোন হদিস নেই।

—আজ আবার যাও। চতুর্থ দিনে ইন্দুমতী আবার স্বামীকে অনুরোধ করলেন।

—ব্যাটারা গা করছে না। শচীনবাবু বিরক্ত হয়ে কোটের বোতাম আঁটতে লাগলেন।

—নিজেদের নয় কিনা, তাই এত উদাসীন। ওদিকে ওর বাপ হয়ত এ-কদিন এ-গলি ও-গলি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

শচীনবাবু বাড়ি ফিরলেন অনেক রাত করে। ইন্দুমতী ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই আজ সুসংবাদ মিলবে, তাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন বারান্দায়।

—কী, পেলে?

—স্বর্গ আর পাতালটা শুধু ঘুরতে বাকি। শচীনবাবু হতাশ, ক্লান্ত মুখে বললেন, ঘুরি আর ঘুরি, আর কেবলই পৃথিবী গোল হয়ে আমারই বাড়ির দরজায় এসে শেষ হয়।

—থানার ইনস্পেকটর কী বললে?

—বললে, একে হাবা আর পাগল, নিরেট অপদার্থ বুঝে ছেলেটাকে কে বাড়ি থেকে আলগোছে বিদায় করেছে, তাই আর খোঁজ-খবর নিচ্ছে না।

—মিথ্যে কথা! ইন্দুমতী শিউরে উঠলেন।

—আরো বললে, কোন আশ্রম-ফাশ্রমে আপনিও ওকে দিয়ে দিন, গোল্লায় কি চুলোয় যেখানে খুশি চলে যাক।

বুবু সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, (বলে রাখি, তার অভিধানে ও-ই একমাত্র ভাষা বলে তার নাম হয়েছে বুবু)—ইন্দুমতী তাকে দুই হাতে কাছে টেনে নিলেন। সস্নেহ সজল গলায় বললেন, সমস্ত পৃথিবীটাই কি তোমার থানা আর জেলখানা মনে কর নাকি? কেন, আমি নেই?

দেখা গেল, পৃথিবীতে বুবুর কেবল ইন্দুমতী আছে। ইন্দুমতীর ছেলেপুলে নেই। প্রকাণ্ড বাড়ির অরণ্যে খাঁচায় পোরা কতগুলি পাখি, কয়েকটা খরগোস, হরিণ, বিলিতি কুকুর আর বেরাল নিয়ে

তাঁর পরিবার। সেই পরিবারে একজন সভ্য বাড়ল। ভাষাহীনতার দেশে মিশলো এসে আরেক নিস্তব্ধতা।

কিন্তু কুকুর আর বেড়াল, খরগোস আর হরিণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল বাড়ির আনাচে-কানাচে, পাখিরা কেউ দাঁড়ে কেউ খাঁচায়, কুকুরটা খাটের নিচে, বেড়ালটা উনুনের পাশে, হরিণ শুয়ে ছাইয়ের গাদায়, খরগোস-কটা মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে—সমস্ত ঘর জুড়ে এখন বুবু, সমস্ত আকাশ ভরে যেমন দিনের আলো। ইন্দুমতীর হাতে বুবু যেন একটা মস্ত খেলনা। তাকে তিনি নাওয়ান খাওয়ান, দর্জি ডাকিয়ে জামা ছাঁটান নাপিত ডাকিয়ে চুল, ঘুম পাড়ান গান গেয়ে, সর্বদা চোখে-চোখে রাখেন চোখের তারার মত, মার স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখেন তার সমস্ত উৎপাত সমস্ত উন্মত্ততা, যেমন শান্ত শ্যামলতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মাটির নিচেকার আগুন। ওসব বন্য সন্তানদের চেয়ে তাঁর এ-ছেলেটি একটু বেশি দুষ্টু, কিন্তু সবার চাইতে এ বেশি দুঃখী। কেননা সে যে দুঃখী এটুকু বোঝবারও তার ক্ষমতা নেই। খাঁচার দরজা খুলে দিলে পাখি হয়ত উড়ে যাবে মুক্তিতে তার দুই পাখা বিস্ফারিত করে ; কিন্তু কোথায় ওর দরজা, যে দরজা খুলে দিলে ওরও জীবনে আসবে আলো, ওরও জীবনে আসবে মুক্তি !

পাগলামির ঝাপটাটা যখন আসে তখন বুবু এটা ছোঁড়ে ওটা ভাঙে, কিন্তু যখন সেটা চলে যায়, যেন বনের মধ্য দিয়ে ঝড় চলে গেছে। বাকি সমস্ত দিন সে যেন বিষাদে ডুবে থাকে ঘরের কোণটিতে, জানলার পাশ ঘেঁসে, ছোট্ট টুলটির ওপর। হয় কখনো নখ দিয়ে মেঝেয় কিংবা দেয়ালে ম্যাপ আঁকে, নয় তো হেঁট হয়ে বসে হাতের নখ দেখে। খেতে বল হুঁস নেই, শুতে বল ঘুম আসে না, বাজনা বাজাও কানে তালা পড়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটা খরগোসের সঙ্গে বুবুর ভারি ভাব হয়েছে। সেদিন ইন্দুমতী কী খুশিই যে হলেন যখন দেখলেন খরগোসটিকে কোলে নিয়ে বুবু তার গলার নিচে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! আরো যেন

তিনি দেখলেন, বুবুর মুখে স্নিগ্ধ একটু হাসি। সে হাসি পাগলের সেই শীর্ণ শূন্য হাসি নয়, খানিকটা যেন সুস্থ স্বাভাবিক হাসি।

ইন্দুমতীর বুকের ভেতরটা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি তিনি স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, আচ্ছা বুবুকে ভালো করা যায় না ?

—ভালো ? শচীনবাবু এমন একখানা ভাব করলেন, যেন পেতলকে সোনা করতে বলা হচ্ছে।

—হ্যাঁ, ভালো ! মনে হচ্ছে কোথায় যেন কী কল বিগড়েছে, একটু মেরামত করলেই যেন ও জ্বলে ওঠে, কথা বলে ওঠে। এমন মুখ-চোখ, এমন গায়ের রঙ—ঈশ্বর কি সব ব্যর্থ করে দেবেন ?

—ওর চেয়ে আরো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে ব্যর্থ হচ্ছে। শচীনবাবু হতাশ মুখে বললেন।

—কিন্তু তোমার মনে আছে, বাড়িতে সেই সেবার মস্ত নেমন্তন্ন, লোকজন গিসগিস করছে, হঠাৎ বাড়ির ইলেকট্রিক গেল ফিউজড হয়ে—সব অন্ধকারে একাকার। হাসি আর হৈ-চৈ সব এক নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে, রাস্তায়, পাশের বাড়িতে সব জায়গায় আলো,—আমরা রয়েছি মুখ বুজে, ভয়ে প্রায় জড়সড় হয়ে। ডেকে আনা হল মিস্ত্রি, কোথায় কি একটা ইসক্রুপ আঁটল, কোথায় কি একটা হাতুড়ি ঠুকঠুক করলে—অমনি এক পলকে আবার সেই হাসি, আবার সেই হল্লা। তেমনি ওরও কোথায় কি স্নায়ু গেছে ছিঁড়ে—একটু জোড়াতালি পেলেই হয়ত দেখবে ও হেসে হাততালি দিয়ে উঠেছে।

—চেষ্টা করা বৃথা। শচীনবাবু ইজিচেয়ারে শরীরটা আরো এলিয়ে দিয়ে বললেন, আজই বিকেলে ওর বাড়ির লোক ওকে নিতে আসছে।

—বল কী ! ইন্দুমতী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কী করে জানল তারা ?

—বিজ্ঞাপন দেখে।

—আবার বিজ্ঞাপন দিতে গিয়েছিলে কেন ? ইন্দুমতীর মুখে গভীর যন্ত্রণার রেখা ফুটল।

—বা, যার ছেলে তাকে পৌঁছে দিতে হবে না? পরের ছেলেকে তুমি আটকে রাখবে নাকি?

কথাটা সত্যি, তা ইন্দুমতীও জানেন। কিন্তু যা জানি তাই সব সময়ে আমরা মানি না। ইন্দুমতী ম্লান মুখে বললেন, কে আসছে?

—স্বয়ং ছেলের বাপ।

—কোত্থেকে আসছে?

—আরা থেকে।

—আরা থেকে! ইন্দুমতী বিস্মিত গলায় বললেন, বাপের নাম কী?

—গিরিধারী তেওয়ারি।

—কী সর্বনাশ। ছেলেটা খোট্টা নাকি?

—হতে বাধা কোথায়? খোট্টা হাবাও হাবা, বাঙালী হাবাও হাবা।

—মিথ্যে কথা! ইন্দুমতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এমন নাক-মুখ, এমন কমনীয়তা বাংলার মাটিতে ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না। যে-সে এসে আমার ছেলে বললেই ওকে দিয়ে দেব—তা হচ্ছে না, তাকে আদালত পর্যন্ত যেতে হবে।

এখন থেকে তর্ক করা বৃথা, বিকেলে গিরিধারী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর উদরদেশকে যদি পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে তাঁর গিরিধারী নাম সার্থক বলতে হবে।

বাইরের ঘরে একটা সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে গিরিধারী হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

—কান্না কেন? শচীনবাবু সান্ত্বনা দেবার পথ খুঁজে পেলেন না। বললেন, ছেলে এখুনি এসে যাচ্ছে।

ইন্দুমতী বুবুকে চমৎকার সাজিয়েছেন একেবারে খাঁটি বাঙালী ঠাটে। পরনে কোঁচা-ঝোলানো লম্বা ধুতি, গায়ে গরদের হালকা পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা-জুতো। কাঁধের ওপর থেকে সিলের উড়ুনি ঝুলছে।

—মনুয়া রে! গিরিধারী ভুঁড়ি ফুলিয়ে সিংহনাদ করে উঠলেন।

পাশে পরদার আড়ালে ইন্দুমতী দাঁড়িয়ে ছিলেন, আগন্তুক বুবুকে চিনতে পেরে উল্লাস করে উঠল দেখে তাঁর বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল।

তুই হাতে মুখ ঢেকে গিরিধারী কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর কান্নার প্রাবল্যে সোফাটা পর্যন্ত দুলে-দুলে উঠছে।

বোঝা গেল এ কান্না তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশার পর নিষ্ঠুর ব্যর্থতার কান্না, কেননা এ বালক তাঁর মনুয়া নয়। মনুয়ার হাতে ছিল লোহার বালা, কানে মাকড়ি আর মাথায় বিঘৎখানেক টিকির গুচ্ছ।

পরদার আড়ালে থেকে ইন্দুমতী বুবুকে ব্যাকুল হাতে টেনে নিলেন তাঁর বুকের মধ্যে।

তুই

শোনা গেল, বম্বেতে কে-এক পার্শি ডাক্তার আছেন, যিনি নাকি এ-সব ব্যারামে ধন্বন্তরি। অর্থাৎ বিষণ্ণ পাগলের মুখে তিনি শুধু হাসি ফোটান না, রুদ্ধবাকের মুখে ফোটান ভাষা, জড়ের মাঝে আনেন বুদ্ধির দীপ্তি, আড়ষ্টকে করে তোলেন প্রাণ-চঞ্চল। ইন্দুমতী ধরে পড়লেন, বুবুকে নিয়ে বম্বেতে যেতে হবে।

—বম্-বে! শচীনবাবুর চোখ গোল হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি। ইন্দুমতী স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, ঈশ্বর যখন এ-দায়িত্ব দিলেন তখন সাহস করে তা বহন করতে হবে।

ইন্দুমতীকে ঠেকানো গেল না। চলে আসতে হল বম্বে। সেখানে হোটেলে হাসপাতালে দীর্ঘকাল থেকে আরো অনেক জায়গায় তাঁরা গেলেন—সমুদ্রে, পাহাড়ে, এমনকি পাহাড়ের গুহায়, সন্ন্যাসীর সন্ধানে। এবং তোমরা বিশ্বাস করো, বছর-দুই পরে বুবু সর্বাঙ্গীন ভালো হয়ে উঠল।

. সে শুধু রোগ থেকে স্বাস্থ্যে ফিরে আসা নয়, এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে ফিরে আসা।

চিকিৎসায় ও সেবায়, গভীর মাতৃস্নেহের নিবিড় আবেষ্টনে ধীরে ধীরে বুবুর জীবনের থেকে আতঙ্কময় কালো যবনিকাটা উঠে গেছে। তাই সে উঠেছে এখন হেসে, কথা কয়ে, হাততালি দিয়ে। যেন এতদিন সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল, ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখে, ভয় নেই, মায়ের পাশটিতে সে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে।

ইন্দুমতী বললেন, আরো ঘুমুবি, বুবু ?

—না মা,—দূরে পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যের ঝিকিমিকি দেখতে-দেখতে বুবু বললে, আর ঘুমুবো না। তুমি একটা গান গাও। ভোরবেলাকার গান।

ইন্দুমতী গান ধরলেন, আর বুবুও স্বচ্ছন্দে সুর মেলাতে লাগল।

এ-সময়টাতে তাঁরা আছেন মুসৌরিতে। শুধু বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে। ঋতু যখন প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে, শচীনবাবু কলকাতা থেকে টেলি করে পাঠালেন, এবার তাঁদের ফিরে আসা দরকার।

পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা হতে লাগল।

বুবু জিজ্ঞেস করলে, কোথায় চলেছি মা, আমরা ?

—কলকাতায়।

—সে কোথায় ?

—বা ! সেইখানেই তো আমাদের বাড়ি।

—বাড়ি ! বুবু অবাক হয়ে বললে, যাঃ !

—কেন, তোর কিছু মনে নেই ? সেই তোর কতগুলি পোষা খরগোস ছিল, হরিণ ছিল, জানলার পাশে টুল পেতে বসে সেই তুই রাস্তা দেখতিস—

—কী যে তুমি বলো মা, বুবু রকিং-চেয়ারে দুলতে-দুলতে হাসিমুখে বললে, আমি বলে এখন কিনা বন্দুক কাঁধে করে বাঘ শিকার করতে যাব, বয়ে গেছে আমার খরগোস পুষতে ! আর, টুল পেতে জানলার

পাশে বসে থাকা! বুবু এবার শব্দ করে হেসে উঠল, কেন, তোমার কলকাতায় পায়ে-হাঁটবার রাস্তা নেই, ডিঙোবার মত পাহাড় নেই যে বোকার মত চুপ করে বাড়িতে বসে থাকব?

—তোর তবে কী মনে হয়? কোথায় তুই ছিলি?

—কোথায় আবার থাকব! এইখানে।

রাত্রে ট্রেনে বুবু ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলুতে-বুলুতে ইন্দুমতী বললেন, ওঠ, কলকাতা এসেছে।

এই কলকাতা! বিস্ময়ে বুবুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কত লোক, কত রকম তাদের পোশাক, আর কী বিচিত্র কোলাহল! স্তব্ধতার থেকে সে যেন একটা শব্দের সমুদ্রে এসে পড়েছে! প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে সে আরো অবাক হয়ে গেল। কত রকমের গাড়ি, আর কী তাদের গতির উদ্দামতা! মনে হল, কলকাতাটা যেন কোথাও এক জায়গায় থেমে নেই, শব্দের ঝড় তুলে পাগলের মত ছুটে চলেছে। বুবু হাততালি দিয়ে উঠল, বললে, সুন্দর কলকাতা!

—এত পাহাড় আর মাঠ দেখে এলি, তার চেয়েও?

—অনেক, অনেক সুন্দর! বুবু তন্ময়ের মত বললে, ওরা সব বোবা, বোকা লোকের মত এক জায়গায় টুল পেতে বসে আছে। আর এ চলেছে ছুটে, লাট্টুর মত কে ঘুরিয়ে দিয়েছে একে!

শচীনবাবু মোটর নিয়ে স্টেশনে এসেছিলেন। হাসিমুখে বললেন, কি বুবু, চিনতে পারো?

বুবু আপাদমস্তক তাঁকে দেখে গম্ভীর হয়ে বললে, দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!

—কী করে পড়বে? ইন্দুমতী বললেন, ওর যখন জ্ঞান হয় তখন তুমি কাছে ছিলে না। চেতনার পর দেখছে কেবল আমাকে, আমাকেই চিনেছে শুধু মা বলে।

মোটরে উঠে বুবুর চাঞ্চল্যের আর সীমা রইল না। বললে,

গাড়িটাকে কি মা কেউ হাউইয়ের মত ছেড়ে দিয়েছে, নইলে এটা চলে কী করে? একটার সঙ্গে একটার ধাক্কা লেগে সব চুরমার হয়ে যায় না কেন?

কতক্ষণ পরেই বাড়ির দরজার কাছে গাড়িটা থেমে গেল দেখে বুবুর ভালো লাগল না।

শচীনবাবু বললেন, নামো।

—এক্ষুনি?

—হ্যাঁ, এই তো আমাদের বাড়ি। ইন্দুমতী বললেন।

—বাড়িগুলোও, মা, সব পাখা মেলে উড়ে চলে না কেন? বুবু হাসতে-হাসতে বললে, এরা কেন বোকার মত থেমে আছে?

বাড়িতে এসেই ইন্দুমতী শত হাতে কাজে লেগে গেলেন—গোছগাছ করতে, জায়গারটা জায়গায় রাখতে গুছিয়ে। কিন্তু দেয়াল-ঘেরা বাড়ির ভেতরটা বুবুর ভালো লাগল না। কলকাতা তাকে ডাক দিয়েছে—রঙের, শব্দের, গতির কলকাতা। তাই এক ফাঁকে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে, চড়চড়ে রোদ উঠে গেছে, ইন্দুমতী বুবুর খোঁজ করতে এলেন।

—চান করবি আয়, বুবু। গায়ের কোটটাও বুঝি এখনো খুলিস নি?

কিন্তু কোথায় বুবু? এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ছাত, সিঁড়ির ঘর, বাথরুম, খাটের তলা—সব তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, ঘর-দোর ওলোট-পালোট করে, জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু বুবু কোথায়?

ইন্দুমতী আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়লেন। শচীনবাবু ড্রাইভারকে বললেন, স্টার্ট দাও গাড়িতে।

বুবু তখন এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—খানিকটা তন্ময়, দিশেহারার মত। সব তার কাছে চমৎকার নতুন লাগছে—লোক আর গাড়ি, বাড়ি আর দোকান, শব্দ আর গতি।

কিন্তু কতক্ষণ আর একটানা হাঁটা যায়! সূর্য উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপর, নাওয়া নেই খাওয়া নেই,—বুবু এ চলেছে কোথায়? পেটে পাক দিয়ে উঠতেই সে ফিরল, ঘামে তখন তার কোটটা প্রায় ভিজে উঠেছে—কিন্তু পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, দুর্গম অরণ্য। কোথায় তার সেই বাড়ি!

উদ্‌ভ্রান্তের মত এ-গলি ও-গলি সে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোথাও কিছুর ঠিকানা পেল না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ভয়ে, ক্লান্তিতে তার চোখে প্রায় জল দাঁড়িয়ে গেল। পথচারী একজন ভদ্রলোককে সে বললে, আমি হারিয়ে গেছি।

ভদ্রলোক বললেন, বাড়ি কোথায়?

—তা জানি না।

—বাড়িতে আছে কে?

—মা আছে, বাবা আছে—

—বাবার নাম কী?

—তা আমায় কেউ শিখিয়ে দেয়নি।

আস্তে আস্তে ভিড় জমতে লাগল। অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করলে, অনেক রকম জেরা; কূলের কোনই কিনারা হল না। আপিসের সময়; কেউ হাঙ্গামা জমাতে রাজি নয়, একবার উঁকি মেরে পাশ কাটিয়ে সব সরে যেতে লাগল।

অলস কৌতূহলে যোগেশবাবুও তেমনি ভিড়ের মধ্যে মুখ বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু পথহারা বালকের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর সমস্ত শরীর আনন্দে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। প্রথমটা তিনি কিছু বিশ্বাস করতে পারলেন না, মনে হল জাগ্রত দিনের আলোকে তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু সন্দেহ করবেন তিনি কাকে? সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চিবুক, সেই হাত পা—সমস্ত সেই তাঁর নীলুর! দু-বছরের ওপর যে নিরুদ্দেশ! নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ করতে পারেন, কিন্তু নীলুকে নয়,—সে তাঁর বুকের হাড়, চোখের তারা, হাতের নড়ি!

দুই হাতে ভিড় ঠেলে যোগেশবাবু পাগলের মত বুবুকে বুকে তুলে নিলেন, শিশুর মত কেঁদে ফেললেন আনন্দে। চেঁচিয়ে উঠলেন, এই যে আমার নীলু—

—নীলু! বুবু বুঝিবা সামান্য প্রতিবাদ করল।

—হ্যাঁ, নীলু, নীলু—আমার নীলু!

সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কে এ, মশাই?

—আমার ছেলে!

অপরিমিত উৎসাহে যোগেশবাবু ছেলে নিয়ে ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এলেন, হাত তুলে দাঁড় করালেন ট্যাক্সি, উঠে পড়লেন দুজনে।

মুহূর্তে যেন একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। বুবুর কাছে সমস্ত কলকাতাটাই একটা ম্যাজিকের মত মনে হচ্ছে।

যোগেশবাবু বললেন, আমাকে চিনতে পাচ্ছিস না?

—পাচ্ছি।

তার মুখে কথা শুনে যোগেশবাবু বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

—পাচ্ছি, বুবু বললে, যদি আমাকে চাট্টি এখন খেতে দাও। সকাল থেকে আমি উপোস।

—কী তুই খেতে চাস? তোর মা আজ তোকে বাজার থেকে কী এনে খাওয়াবে? স্নেহের আবেগে যোগেশবাবু ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

বুবু অবাক হয়ে বললে, মা!

—হ্যাঁ, মাকে তোর মনে পড়ে না?

—বা, তবে কি আমরা মার কাছেই চলেছি নাকি?

—হ্যাঁ রে।

—আমাদের নিজেদের বাড়িতে?

—হ্যাঁ, ঐ তো বাঁয়ে বাঁক নিলেই আমাদের বাড়ি। যোগেশবাবু তাকে আদর করে কাছে ডেকে আনলেন, তোকে এত কথা কে শেখালো নীলু?

—আমার মা। চল, এক্ষুনি তাকে দেখতে পাবে।

যে বাড়ির দরজায় এসে গাড়ি থামল, দেখেই বুবু বুঝল ঠিক জায়গায় তারা আসেনি। ভাঙা, রঙ-ওঠা, নোনা-ধরা একটা গরিব একতলা বাড়ি, এমন বাড়িতে কখনো তার মা থাকে না।

যোগেশবাবু গাড়ির মধ্যে থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, দেখে যাও এসে কে এসেছে!

দেয়ালের যেখানে যত ফোকর ছিল বাড়ির মধ্যেকার সমস্ত লোক বেরিয়ে আসতে লাগল।

—নীলু যে! এ যে আমার নীলু! যোগেশবাবুর স্ত্রী স্নেহলতা পুত্রশোকে একান্ত শীর্ণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সর্বাগ্রে ছেলেকে ছিনিয়ে নিলেন তাঁর বুকের মধ্যে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, কোথায় ছিলি এতদিন?

—ইনি কে, পরিচিত হবার জন্যে বুবু জিজ্ঞাসু চোখে যোগেশবাবুর দিকে তাকালো।

যোগেশবাবু বললেন, চিনতে পাচ্ছিস না? তোর মা!

তার মা! বুবু তীক্ষ্ণ চোখে স্নেহলতার দিকে তাকালো। হাসল একটু মনে-মনে। এরা সব বলে কী! তার মা এর চেয়ে কত বেশি সুন্দর!

নীলুর পিঠোপিঠি যে বোন, নাম উমা, ঠোঁট উলটিয়ে বললে, কদিন বাইরে থেকে নীলুদাটা ভারি চালিয়াৎ হয়েছে, আমাকে আর চিনতেই চায় না!

যোগেশবাবু উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠলেন, সেই নীলুই আর নেই! মুখে এখন ওর কথা, চোখে এখন ওর বুদ্ধি, শরীরে এখন ওর স্বাস্থ্য—

—কিন্তু পেটেই আপাতত কিছু খাদ্য নেই। বুবু বলে উঠল।

সবাই উঠল সমস্বরে হেসে।

তারপর শুরু হল প্রশ্নের শিলাবৃষ্টি।

—কোথায় ছিলি এতদিন, কার কাছে ? কেমন করে কেটে গেল সেই পাগলামির কুয়াসা ? কী মন্ত্রবলে মুখে ভাষা এল, চোখে এল হাসি ? কেমন করে ফিরে এলি আবার পথ চিনে ?

বুবু উত্তর দিল না। তার সে কীই বা জানে! সে শুধু বুঝল, এদের বাড়িতে তারই বয়সী একটি ছেলে ছিল, হয়ত-বা সে ছিল হাবা, হয়ত-বা পাগল,—বহুদিন থেকে নিরুদ্দেশ ; তার মাঝে সেই ছেলের প্রতিবিম্ব দেখে এমন করে সবাই কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে।

কিন্তু তার পক্ষে এখন কোনরকম বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না, কেননা খিদেয় সে দাঁড়াতে পারছে না।

তাই সে ব্যস্ত হয়ে স্নেহলতাকে উদ্দেশ্য করে বললে, চান করবার জল কই ? ভাত বেড়ে দাও শিগগির। বিছানা করে রাখো। খেয়ে-দেয়ে আমাকে লম্বা ঘুম দিতে হবে। সারা রাত ট্রেনে আমি ঘুমুতে পারিনি।

বাড়ি তোলপাড় হয়ে উঠল। এ এনে দেয় সাবান, ও এনে দেয় গন্ধতেল, এ দেয় নেবু কেটে, ও বসে পাখার হাওয়া করতে ; এ যায় রাবড়ি কিনতে দোকানে, হাত মোছবার জন্যে ও দেয় তোয়ালে এগিয়ে ; এ এনে দেয় ভাজা মশলা, ও এনে দেয় লবঙ্গ।

খাওয়া দাওয়ার পর বুবু বললে, নিরিবিলিতে আমি এখন একটু ঘুমুব। এরা কেউ যেন না আমাকে বিরক্ত করে।

উমা ফের ঠোঁট ওল্টালো, কী সাঙ্ঘাতিক চালিয়াৎ! কোথায় একটু গল্প করব সবাই, তা না, বুড়ো পণ্ডিতের মতন দিনেরবেলায় ঘুম!

—ঘুম থেকে উঠে বিকেলবেলা আমি গল্প করব খুকি। বুবু বললে—মেয়েরা তো গল্প করে না, বকবক করে।

—ইস্, খুকি! দুদিনের বড়লোক ভাতকে বলে অন্ন! তোরা সব চলে আয় ওর ঘর ছেড়ে।

ঘর খালি হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। নিরালা ঘরে বিছানায় শুয়ে বুবু চোখ বুজোল। কিন্তু ঘুম আসে কই! চোখ খুললেই তার

মাকে কেবল মনে পড়ে—হয়ত স্নান করেন নি, খান নি, শুকনো চুলে ধুলোমাখা শাড়িতে জানলার পাশে বসে আছেন।

কেমন দেয়াল দিয়ে চাপা ছোট-ছোট ঘরগুলি, কড়িকাঠের তলায় দেয়ালের কোনে রাশি-রাশি ঝুল, জায়গায় জায়গায় মেঝের থেকে চলটা গেছে উঠে, নড়বড়ে তক্তপোসে তুলো-ওঠা এই শক্ত তোশকের বিছানা—সব কেমন তার কাছে ভয়ঙ্কর অচেনা মনে হল। মনে হল ঘরে যেন বেশি আলো নেই, কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। মনে হল, সে যেন কোন রাজকুমার, দৈত্যপুরীতে বন্দী হয়েছে সহসা। ঘুমিয়ে পড়লেই সর্বনাশ।

বুবু ধড়মড় করে উঠে বসল। কেউ কোথাও নেই কাছাকাছি—তাকে বিশ্রামের বিস্তৃত অবকাশ দিয়ে সবাই দূরে বসে আনন্দ-গুঞ্জন করছে। যোগেশবাবু আপিসে চলে গেছেন, বলে গেছেন বন্ধু-বান্ধব এনে রাত্রে ফীস্ট দেবেন। স্নেহলতা তারই তদারকে এখন থেকে তৎপর।

খিল খুলে বুবু আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল,—আর তাকে পায় কে!

কোথায়, কতদূর যাচ্ছে জানে না, কিন্তু এইটুকু সে জানে, যেখানে এসে পথ তার ফুরিয়ে যাবে, আর যখন সে চলতে পারবে না,—তখন, তখনই দেখবে মা তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

অনেক রাত করে বুবুর ঘুম ভাঙল। ডাকল, মা!

ইন্দুমতী তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, কী বাবা!

—এ আমি কোথায় আছি?

—বাড়িতে, তোমার খাটে, আমার পাশটিতে।

—আমার মাথায় এ-সব ব্যাণ্ডেজ কেন, মা?

—রাস্তায় তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলে—

—বিচ্ছিরি রাস্তা, মা, কলকাতার! যেন কোন রাস্তাই আমাকে

চলতে দেয় না, কেবল বলে, থামো! প্রত্যেক বাড়িই আমাকে হাত বাড়িয়ে ডাকে, বলে, এ বাড়িতে এস। মনে হয়,—বুবু যেন একবার কেঁপে উঠল—মনে হয় আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে সমস্ত বাড়ি থেকে লোক বেরিয়েছে দলে দলে!

—তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছিলে, বুবুর কপালে হাত বুলুতে-বুলুতে ইন্দুমতী বললেন।

—না মা, কলকাতায় আমরা থাকব না!

—না, একটু ভালো হলেই আবার আমরা পশ্চিমে চলে যাব।

—হ্যাঁ, অনেক দূরে, অন্ধকারের মধ্যে। যেখানে আমাদেরকে কেউ দেখতে পাবে না। আলোটা নিবিয়ে দাও, মা,—বুবু করুণ আর্তনাদ করে উঠল,—আলো জ্বালা থাকলে জানলা দিয়ে আমাকে ওরা দেখে ফেলবে!

ইন্দুমতী আলো নিভিয়ে দিলেন।

মূল্য

আপিসে খাসকামরায় বসে লম্বা-চওড়া একটা অর্ডার লিখছিলুম, হঠাৎ ফাউন্টেন পেনের কালি গেল ফুরিয়ে।

কলিং বেলে একটা চড় মারলুম।

আশ্চর্য, কারু সাড়া-শব্দ নেই।

এবার ডাকলুম গলা ছেড়ে—চাপরাশি!

কে বা কোথায়!

এবার একেবারে নাম ধরে—সনাতন!

এ কি আমি অরণ্যে বসে আছি নাকি? পরদা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, সনাতন এজলাসের নিচেতে দিব্যি একখানা মাদুর বিছিয়ে তোফা একটি ঘুম দিচ্ছে।

চোখা জুতোর ডগা দিয়ে তার গায়ে একটা ঠোক্কর দিলুম। স্বয়ং যমদূতকে দেখলেও সে এত ভয় পেত না। সে কি জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে, তার চোখে যেন সেই অবোধ জিজ্ঞাসা।

বললুম, শিগগির দোকান থেকে একটা ওয়াটারম্যান কালি নিয়ে এস, ছোট শিশি। বলে ঠন্ করে একটা টাকা ফেলে দিলুম।

সে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুট দিল। এত সহজে সে নিস্তার পাবে, এটা তার বিশ্বাসের বাইরে।

কিন্তু আধঘণ্টার ওপর ঠায় বসে আছি, সনাতনের দেখা নেই। এর মধ্যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন, রেলোয়ে টাইম-টেবল, শিপিং, এমনকি ওয়েদার রিপোর্ট পর্যন্ত কিছুই আর বাকি রাখিনি, কিন্তু সনাতন আজও গেছে কালও গেছে। অথচ অর্ডারটা আমার এক্ষুনিই লিখে ফেলা চাই। আর, দোয়াতদানিতে আমাদেরকে যে কালি

দেওয়া হয় তাতে কলম ডোবানোর চেয়ে সকালবেলার চায়ে বিকেল-বেলা চুমুক দেয়া সহজ।

রাগে তখন শুকিয়ে কালো হয়ে গেছি, সনাতন কালি নিয়ে উপস্থিত।

ক্ষিপ্তের মতো বললুম, এত দেরি ?

সনাতন উদাসীনের মতো বললে, তা একটু হয়েছে।

একটু ? ওকে মারব না কাটব ভেবে পেলুম না। চেঁচিয়ে উঠলুম, এক ঘণ্টারও ওপর হয়ে গেছে। এখান থেকে এখানে দোকান, যেতে-আসতে তোমার একঘণ্টা লাগে ?

সনাতন লোকটা প্রায় বুড়ো, পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কাঁচা-পাকা দাড়িতে গোলাকার মুখখানা বিনয়ে আরো গোলাকার করে সে বললে, আপনি ধর্মাধিকরণ, আপনি বিচার করে বলতে পারেন একঘণ্টা না উনষাট মিনিট। তা, আমি অস্বীকার করছি না দেরি হয়েছে।

কেন হল ?

পথে একটা লোক সং সেজে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছিল আর চোখের মলম ফিরি করছিল, তাই এক প্যাকেট খাঁটি দেখে দরাদরি করে কিনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

চোখের মলম !

হ্যাঁ হুজুর। ছোট ছেলেটার কদিন থেকে চোখে কি-রকম একটা ঘা হয়েছে।

রাগে অন্ধ হয়ে গেলুম। বললুম, আমার কালির চেয়ে তোমার ঐ মলম বেশি জরুরি মনে হল ?

সনাতন নির্লিপ্ত গলায় বললে, একফোঁটা কালি না হলে রাজ্য আর তলিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু একফোঁটা ওষুধ না পেলে চোখদুটো ওর যায়, ধর্মাবতার। বলে, নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় সে তার মুখমণ্ডলে একটি হাস্য বিস্তার করলে।

স্প্রিং টিপে কলমে কালি ভরে নিয়ে বললুম. ভেবেছিলুম

তোমাকে জরিমানা করব; কিন্তু না, তোমার আর চাকরি করা পোষাবে না।

অপরাধ?

ফের মুখে-মুখে তর্ক! ধমক দিয়ে উঠলুম।

কিন্তু আসামীকে তো জিজ্ঞেস করবেন, গিলটি না নট-গিলটি? সনাতন হাসল।

আমি যেন ওর সন্তানের মত, সনাতনের এমনি একখানা ভাব। কিন্তু আমি যে মহকুমার এক হাকিম, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বাঘ-গোরুকে যে এক ঘাটে জল খাওয়াই, এসব সে এক মুহূর্তে ভুলে গেল নাকি?

বললুম, এজলাসে তুমি ঘুমুচ্ছিলে কোন্ সাহসে?

ও, এই কথা? সনাতন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, ঘুম পেলে কি আর কারু খেয়াল থাকে এটা এজলাস না জেলখানা, রেল না ইস্টিমার, মাদুর না গদি!

ওর এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলুম। বললুম, তারপর একটা কালি আনতে বললুম, তুমি গ্রাহ্যই করলে না।

ঐ তো বললুম, একবার হাটের থেকে কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে গোটা একটা লণ্ঠন কিনে নিয়ে এলুম। বলে, তেলের দেখা নেই, লণ্ঠন! বলে দিব্যি আবার সে হাসল।

আবার মুখে-মুখে তর্ক করছ!

তবু ওকালতি পাশ করিনি। এটা তর্ক নয়, স্বভাব,—স্বভাবের দোষ। আমার কথা বলার ধরনটাই ঐ রকম।

কার সঙ্গে কী রকম কথা বলতে হয় জানো না?

কার সঙ্গে আবার! আমার বড় ছেলেটা না যদি মরে যেত আর যদি তাকে স্বর্গে না পাঠিয়ে বিলেত পাঠাতে পারতুম—

চুপ কর!

—তবে আজ আমার ঘুমটা মারে কে!

বললুম, তোমার সার্ভিস-বুকটা নিয়ে এস। ভেবেছিলুম জরিমানা

করব, কিন্তু না, তোমাকে বিদায় হতে হবে। আমি কালেক্টরকে লিখে দিচ্ছি।

সে কী সর্বনাশ! সনাতন যেন একটা অভিনয় করল, কথাটা গায়ে মাখল না।

বেয়াদব, এখনো কথা বলতে শেখোনি—তোমার চাকরিই যাওয়া উচিত!

বলেন কী? একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিন না! তাহলেই চুকে যায়!

টেবিলের পায়া থেকে একটা স্লিপ ছিঁড়ে কয়েক লাইন তাতে লিখে তার হাতে দিয়ে বললুম, এটা নাজিরকে দিয়ে এস।

সনাতন হাসিমুখে বললে, এখনো চাকরিটা যায়নি বুঝি?

নিয়ে যাও!

তা যাচ্ছি, কিন্তু চাকরিটা নেবেন না। এ তো আর ফাউণ্টেন-পেনের কালি নয় যে ফুরিয়ে গেলেই ভরে নেওয়া যাবে!

নিচু হয়ে খসখসিয়ে লিখতে লিখতে বললুম, বেশ তো, ভালো করেই ঘুমুতে পাবে এবার।

বলেন কী ডাকাতের মত! যাবার মুখে সনাতন থেমে পড়ল, —কালির পরেও সাদা দাগ থেকে যায়, তেমনি ঘুমের পরেও খিদে থাকে জেগে। চাকরি গেলে খাব কী?

বেরিয়ে যাও বলছি! গর্জন করে উঠলুম।

সনাতন সত্যিই বেরিয়ে গেল। সেই যে গেল, আদালতের ত্রিসীমানায়ও আর আসতে পারল না। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যেন এক চড়ে একটা মশা মারার মত। কাউকে মারতে পারার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, যেমন পাখি-শিকারে ব্যাধের আনন্দ। সেখানে পাখির মৃত্যুর চেয়ে ব্যাধের নির্ভুল লক্ষ্যস্থাপনাই বেশি মূল্যবান।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। অধুনাতন নিয়ে আমাদের কারবার, সনাতনের ধার ধারিনে। রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে কোন্

পিঁপড়েকে জুতোর তলায় মাড়িয়ে দিলাম এ দেখতে গেলে এগিয়ে চলাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমি কৃতিত্বের পথে তখন খুব এগিয়ে চলেছি, বল্‌গা-ছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত। আর এগিয়ে চলাই উন্নতির চিহ্ন।

আগে ছিলাম মহকুমার হাকিম, এখন একেবারে জেলার জজ। দেখতে-দেখতে, ক-বছরে। বনে উড়তে-উড়তে টিয়াপাখির মত এখন সোনার দাঁড়ে উঠে বসেছি।

একেক সময় ভালো লাগত না এই সোনার শিকল, লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইল, হিজিবিজি লেখা রাশি-রাশি কাগজের বস্তা, সারাদিন কেবল পোকার মত এ-বই থেকে ও-বইয়ে হেঁটে যাওয়া; ভালো লাগত না এই তকমা আর চাপরাশ, সেলাম আর হুজৌর। তাই একেক সময় একা-একা বেরিয়ে পড়তুম গাঁয়ের পথ ধরে, দড়ি দিয়ে টানা নৌকোয় একলা খাল পেরিয়ে, ক্ষেতের আল ভেঙে, চাষাভুষোর আঙিনার পাশ দিয়ে। একেক সময় খোলা আকাশের নিচে বিস্তৃত একাকীত্বে নিজেকে একজন খুব সাধারণ মানুষ বলে অনুভব করতে খুব ভালো লাগত। ঐ যে নিরক্ষর চাষাটা মাঠে হাল দিচ্ছে ওর সঙ্গে সত্যিই আমার কোন তফাৎ নেই—এমনি একটা চিন্তায় চমৎকার মাদকতা পেতাম। আমি যে এত জানি আর ও যে কিছুই জানে না, এই দুয়ের মধ্যে সত্যিকারের কোন তফাৎ আছে বলে মনে হত না।

এই সহরটাতে নতুন এসেছি, কিন্তু ইট-বালি-সুরকির সীমা পেরিয়ে এলেই বাংলা দেশ সর্বত্র বাংলা দেশ। সেই ধানের ক্ষেত, কচুরিপানা, বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। ঘাস খেতে না পেয়ে পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে গোরুর, ম্যালেরিয়ায় ভুগে পিলে ফুটে উঠেছে মানুষের। রাত হলেই কেবল ব্যাঙ আর জোনাকি। তবু প্রকৃতির এই অসীম বিস্তার আমার ভালো লাগত; বলেছি তো, ভালো লাগত নিজেকে খুব একা, অসহায়, অসম্পূর্ণ বলে মনে করতে।

লোকচক্ষু এড়িয়ে সেদিন সন্ধ্যায় কতদূর যে এসে পড়েছি খেয়াল ছিল না, হঠাৎ একটা গভীর মেঘ-গর্জন শুনে খেয়াল হল, আর রক্ষে

নেই। সমস্ত আকাশে যেন কে কালির দোয়াত ঢেলে দিয়েছে। চারিদিকে চেয়ে অবস্থাটা বুঝে নেব, তার আগেই তীক্ষ্ণ ধারায় জল নেমে এল। ঈশ্বর আছেন, তাই অদূরেই একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেলুম। ছুটে আশ্রয় নিলুম তার দাওয়ায়।

তেরো-চোদ্দ বছরের রুগ্ন একটা ছেলে দাওয়ায় বসে ছিল চুপ করে, আমার দ্রুত আবির্ভাবের শব্দে শঙ্কিত হয়ে উঠল। বললে, কে?

মানুষ।

ছেলেটি গলার আওয়াজ পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, ভদ্রলোক?

তোমার কী মনে হয়?

ছেলেটি করুণ স্বরে বললে, আমি দেখতে পাইনা কিনা!

বুকটা ধক্ করে উঠল। পকেট থেকে টর্চ বার করে নব্ টিপলুম। দেখলুম তার দুটি চোখই গেছে, আলোর উত্তাপেও তাতে এতটুকু চাঞ্চল্য এল না।

বললুম, এখানে বসে কী করছ?

ছেলেটি বললে, বৃষ্টির শব্দ শুনছি। পা-টা মচকে গেছে বলে আজ আর বেরুতে পারিনি। পরে জিজ্ঞেস করলে, তুমি বুঝি হাট থেকে বাড়ি ফিরছিলে?

হ্যাঁ।

কী কিনলে?

একজোড়া গামছা আর একটা হারিকেন।

আমাকে খুব বড়লোক ঠাউরে ছেলেটি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কী করো?

আদালতের পেয়াদা।

বলো কী! আমার বাবাও যে আদালতের পেয়াদা ছিল! ডেকে দেব বাবাকে? বলে, আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ছেলেটি ভেতরে চলে গেল। অন্ধ হলে কী হবে, ঘরের সমস্ত অলি-গলি তার মুখস্থ।

তক্ষুনি ফিরে এসে ছেলেটি বললে, বাবা তোমাকে ভেতরে যেতে বললে, ওর অসুখটা বড্ড বেড়েছে।

বললুম, কী অসুখ?

হাঁপানি। এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেই।

এক পা ভিতরে যেতেই ঘর, আর সেই একখানিই ঘর। খড়ের গাদার ওপর একপাশে একটা গোরু শুয়ে, আর ওপাশে শুকনো একটা বুড়ো। দারিদ্র্য কথাটার অর্থ শুধু অভিধানেই পড়েছি, কিন্তু টর্চ টিপে এখন, এতদিনে, তাকে প্রত্যক্ষ মূর্তিমান দেখতে পেলুম। ক্ষণিক টর্চ টিপতেই লোকটা নিশ্বাসের জন্য হাঁ করে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে গ্রাস করে অধীর আগ্রহে চিৎকার করে উঠল—আলো জ্বালা, আলো জ্বালা শিগগির! এ তুই কাকে ধরে নিয়ে এসেছিস, হারাধন!

হারাধনের মুদ্রিত চোখের ওপরে বিস্ময় ও গরিমার একটা ছবি ফুটে উঠল। সে ম্লান কণ্ঠে বললে, ঘরে তেল নেই। গর্তে পড়ে পা-টা মচকে গেছে বলে আজ আর ভিক্ষেয় যেতে পারিনি বাবা।

ভিক্ষেয় বেরুতে পারিস নি, কিন্তু এ রত্ন তুই কোত্থেকে চুরি করে নিয়ে এলি হারাধন! লোকটা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল,—যে-করে পারিস কোথা থেকে একটা আলো নিয়ে আয়! নইলে চোখ ভরে এ ঐশ্বর্যকে দেখব কী করে!

বললুম, আলো লাগবে না। এই তো টর্চ রয়েছে।

ভালো করে তাকালুম তার দিকে। ভালো করে মানে তার জীর্ণ কখানা পাঁজরার দিকে। তার একমুখ রুক্ষ দাড়ি ও এক-মাথা উচ্ছৃঙ্খল চুলের দিকে। তার মুখ যেন কোথায় দেখেছি! এ গলা যেন বিস্মৃত কোন স্বপ্নের স্বর!

এঁকে প্রণাম কর, হারাধন! লোকটা নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল, এ ভিক্ষায় মেলে না, প্রার্থনায় মেলে। প্রণাম কর শিগগির!

হারাধন তার মুদ্রিত, সঙ্কুচিত চক্ষুরেখা তুলে খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল। পরে আমার দূরত্ব পরিমাপ করে-করে এগিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ।

ধরে ফেলে তাকে বাধা দিলুম। অথচ, অভাজন দরিদ্রের একটা প্রণাম নেবো—এতে আমার বিতৃষ্ণার কোন কারণই ছিল না।

বললুম, আমাকে চিনতে পেরেছ, সনাতন ?

আমার বেশবাস তখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পরনে সাদা জিনের একটা শর্টস, মোজাজোড়া অ্যাঙ্কলের ওপরই গোটানো, গায়ে কলার-তুলে-দেওয়া একটা গেঞ্জি। আমাকে সনাতন অনায়াসে পাটের আপিসের কিংবা ইস্টিমার কোম্পানির ছোঁদো সাহেব বলে ধরে নিতে পারত।

চিনতে পারি নি! বিকৃত মুখে সনাতন হেসে উঠল, বালীকে তো শ্রীরামচন্দ্রই মেরেছিলেন, কিন্তু বালী কি তাঁকে চিনতে পারে নি ? কতদিন ধরে মনে মনে আপনার ধ্যান করেছি—কত দিন! আপনাকে আমার কী ভীষণ দরকার !

সেই মুহূর্তে নিজেকে যে কী অসম্ভব দরিদ্র মনে হল কী বলব ! পকেটে গোলাকার একটাও টাকা নেই। আমার কাছে নিশ্চয়ই ওরা কিছু চায়। নিশ্বাসের বাতাসের চেয়েও যা স্থূল, সেই খাদ্য, চোখের দৃষ্টির চেয়েও যা উত্তপ্ত, সেই খাদ্য প্রস্তুত করার জন্যে আগুন। কিন্তু পকেট-দুটোতে অপরিমিত শূন্যতা। যদি বলি কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর, ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, কেননা কাল সকালে হয়ত আর এমন সুকোমল বৃষ্টি নেই, কাল সকালে হয়ত আমার অনেক কর্তব্য, অনেক কঠোরতা। কাল তো এদের কাছে একটা কালান্তর। আর হারাধনের কাছে সকালই কী আর সন্ধেই কী! সোনার ঘড়িটা সঙ্গে আনিনি।

কিছু একটা বলার জন্যে ইতস্তত করছি, সনাতন দুই হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ঈষৎ চেষ্টা করতে-করতে বললে, কখন ?

কোথায় আছেন কত জিজ্ঞেস করে করে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু মনি-অর্ডার করে যে পাঠাব, একসঙ্গে সেই দু-আনা পয়সার সংস্থান করতে পারিনি। হারাধনের ভিক্ষের একটা সুবিধে হবে মনে করে সহরে যখন এসে ঘর নিলাম, মনে মনে আশা ছিল এখানেই একদিন আপনার দেখা পাব, খুব বড় হয়ে আপনি আসবেন। এখন জজ হয়েছেন, না ? আমার আশীর্বাদ কি না ফলে পারে ? কিন্তু এই এক বছর ধরে সমানে এই মাটির সঙ্গে মিশে আছি, উঠতে পারছি না ; নইলে কবে দেখে আসতাম আপনাকে সিংহাসনে। কিন্তু আজ আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে, যে করে হোক। যেখানে তা রেখেছি তা আমি ছাড়া আর কেউ নাগাল পাবে না।

নড়বড়ে হাঁটুতে টলতে-টলতে মাটির দেয়াল ধরে-ধরে সনাতন উঠতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা করে বললুম, কেন মিছিমিছি উঠতে যাচ্ছ !

বা, মনি-অর্ডারের কমিশন ফি-টা বাঁচাতে হবে তো। সনাতন কি রকম করে হাসল।

বিস্মিত, বিরক্ত হয়ে বললুম, কিসের মনি-অর্ডার ?

আপনি আমার কাছে সাড়ে এগারো আনা পয়সা পান না ?

বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, ঘুটঘুটি অন্ধকার, কর্কশ মহোল্লাসে ব্যাঙ ডাকছে, ভাঙা বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের দাঁত—সব মিলে সনাতন ও সনাতনের এই জিজ্ঞাসাটা আমার কাছে একটা রঙিন রূপকথার মত অবাস্তব মনে হল। রুক্ষ, খানিকটা-বা শাসকের গলায় বললুম, আমি আবার কী পয়সা পাবো ?

ততক্ষণে সনাতন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমাকেই অবলম্বন করে। ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললে, সেই আপনার ফাউণ্টেন-পেনের কালি কিনে এনে টাকার চেঞ্জটা তাড়াতাড়িতে ফিরিয়ে দিতে পারিনি, আপনার মনে নেই ? টিপুন জোরে টর্চটা—বাঁশের এই ফাঁকে, অনেক উঁচুতে, সমস্ত ক্ষুধার্ত সংসারের নাগালের বাইরে একটা কাগজের

পুঁটলিতে করে সেই সাড়ে-এগারো আনা পয়সা লুকিয়ে রেখে দিয়েছি।

তাকে ছেড়ে দিলুম, টর্চও নিবে এল। কিন্তু সনাতন নিজের প্রতিজ্ঞার জোরে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভেতর থেকে বহুদিন-সঞ্চিত সেই সাড়ে-এগারো আনার কাগজের পুঁটলিটি বের করে আনল।

শুধু বলল, ঈশ্বর আছেন!

আবার টর্চ টিপলুম। গুণে দেখলুম, একটি পয়সাও কম নয়।

তোমরা হয়ত ভাবছ সে পয়সা আমি নিলুম না, অনেক কথা-কাটাকাটি করলুম, অনেক তাকে পিড়াপিড়ি করলুম, অপমান করছে মনে করে তাকে নিষ্ঠুর ভয় দেখালুম। মোটেই তা নয়—আমি হাত মেলে সেই পয়সা ক-আনা নিলুম, এবং অতি স্বচ্ছন্দে, নির্বিবাদে নিলুম। কেবল একবার ভাবলুম, সংসারে পাপ যে করে তাকে শাস্তি দেবার জন্যে কত যন্ত্র ও কত যন্ত্রণাই আমরা উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু পুণ্য যে করে তার বেলা মনে করি সে নেহাতই একটা সহজ, সাধারণ, দৈনন্দিন কর্তব্য করছে।

বললুম, বৃষ্টি শিগগির ধরবে না। আমি এমনিতেই বেরিয়ে পড়ি।

সনাতন ততক্ষণে তার শয্যায় ফিরে এসেছে, একটিও শব্দ করল না। এ-বৃষ্টিতে একটা গোরু-ছাগলও বাইরে নেই, দড়ি-টানা নৌকোয় খেয়া পেরিয়ে আমাকে সহরে যেতে হবে,—আর্দালিটা পর্যন্ত নেই যে মাথায় ছাতা ধরবে, পকেটে মাত্র সাড়ে-এগারো আনা পয়সা,—তবু অত সব জেনেও সনাতন চুপ করে রইল।

আমার আর মূল্য নেই, আমি ফুরিয়ে গেছি।

জয় হোক

আবুর আজকে সুপ্রভাত। মামিমা আজ সকালবেলা তাকে অতি অনায়াসে চারটি পয়সা দিয়ে ফেলেছেন। এরোপ্লেনে করে এভারেস্ট পার হওয়ার চাইতেও খবরটায় বেশি উদ্দীপনা ছিল। পয়সার মুখ দেখা তার জীবনে হাতের মুঠোয় চাঁদ ধরতে পাওয়া। আজ পুরো চার বছর ধরে মামাবাড়ি সে মানুষ হচ্ছে, কিন্তু ভুলেও কোনদিন সে নিজের বলে একটা পাই-পয়সা পায়নি। পাবেই বা কেন? স্কুলের বই-খাতা, জামা-কাপড় যখনকার যা সব তাঁরা চালাচ্ছেন—এই ঢের। তার বিনিময়ে তার পিঠে যে তু-চার ঘা কিল-চাপড় পড়ে না তা নয়। আবদার করে তার ওপর তু-একটা পয়সা চাইতে গেলেই হয়েছে,— 'মামি এল লাঠি নিয়ে, পালাই, পালাই!'

মামিমার হঠাৎ এই বদান্যতার কারণ, আবু তাঁর হারানো চাবি খুঁজে পেয়েছিল বলে। যে খুঁজে দেবে তাকে বকশিস দেবেন বলে নেহাৎ একটা তিনি কড়ার করে ফেলেছিলেন, তাই আবুর বরাত গেল খুলে। নগদ চার-চারটে পয়সা! আবুকে আর পায় কে! দিগ্বিজয় করে অ্যালেকজাণ্ডারও গর্বে এত স্ফীত হয় নি। ডান পকেটটা তার ভীষণ ভারি লাগছে, যেন বয়ে নিয়ে চলেছে সে হনুমানের মত গন্ধমাদন পর্বত! পয়সাগুলো যেন জ্বলন্ত চারটে আগুনের কণা, পুড়িয়ে পকেট ফুটো করে মাটিতে পড়ে না গেলে হয়!

মামিমা তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললেন, যা তো আবু, আমার জন্যে একখানা সাবান কিনে আন। সাড়ে-পাঁচ আনা দাম, বাকি সাড়ে-দশ আনা ফিরিয়ে এনে দিবি, বুঝলি?

নিশ্চয়, আবু তা বুঝেছে। ভারি তো সাড়ে-দশ আনা পয়সা! অমন অনেক সাড়ে-দশ আনার চাইতে তার এই চারটি পয়সা ঢের

বেশি মূল্যবান। মনে হল ঐ চার পয়সা দিয়ে আবু যেন আজকের পৃথিবীর সমস্ত আলো আর আনন্দ এক কথায় কিনে ফেলতে পারে। তার কাছে কি একটা তুচ্ছ, বিদেশী সাবান!

সাবান যা-হোক সে কিনল কথামত—পকেটে তার এখন সাড়ে-এগারো আনা পয়সা, তার মধ্যে চারটি তার নিজের। ঐ চারটি পয়সা ব্যয় করতে না পারলে তার স্বস্তি নেই। আকাশ তার আনন্দ আজ মাটির ধুলোয় আবর্জনায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে, কোথাও এতটুকু কার্পণ্য করেনি। তারও আজ এই আকাশের মতই অবারিত স্বাধীনতা—এই চার পয়সা দিয়ে যা খুশি সে করতে পারে, কেউ আর তার ওপর হুকুম করবার নেই। তার মন যা চায়।

সেই স্বাধীনতার সুখে আবু পকেট দুলিয়ে বাজার-ময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও মনের মত তার জিনিস মিলল না। হয়ত এক-একটার দাম প্রায় হিমালয়ের চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে। তাতে তো তার ভারি বয়ে গেল! জিনিসই কিনতে হবে—তার ওপর গভর্মেণ্টের এমন কোন কড়াক্কড় আইন জারি হয়নি। ইচ্ছে করলে জিনিস সে কিনতে পারে—এই তার আজকের দিনে জীবনের প্রথম সৌখীনতা।

কিন্তু পয়সা কটা খরচ করে ফেলার জন্যে আঙুলগুলি নিসপিস করছিল। কেন বাপু, গালে পুরে দু-দুটো রসগোল্লা খেয়ে ফেললেই তো হয়, আপদ যায় চুকে! নাহয়, একখানা এক্সারসাইজ খাতা কিনে ফেল না কেন! লেখো তো বালি-কাগজে, রুল-টানা বাঁধানো খাতা তো জন্মে কখনো দেখেছ বলে শুনিনি। না, আবুর খরচের রুচিটা অত খেলো নয়। সে এই পয়সা-কটা দিয়ে একটা অসাধারণ কিছু করবে।

হ্যাঁ, ঐ যে গ্যাস-পোস্টটার তলায় একটি অন্ধ ভিখিরি ছেলে এনামেলের একটা বাটি পেতে ভিক্ষে করছে, তাকেই দেবে সে একটি পয়সা—তার আজকের আনন্দের এক-চতুর্থাংশ। বাকি তিন পয়সার কথা পরে ধীরে-সুস্থে -ভেবে যা-হোক ঠিক করা যাবে।

আকাশের রোদ এসে পড়েছে পৃথিবীর কাদায়, তেমনি ওর চোখের দীপ্তি গিয়ে পড়বে ভিখিরি ছেলেটির দু-চোখের জমাট অন্ধকারে। মুহূর্তের জন্যে ও-ও যে খুশি হয়ে উঠবে তা-ই ঢের—তার সমস্ত বাজার লুট করে নিয়ে আসার চাইতেও বেশি সুখের।

পকেট থেকে একটি পয়সা বের করে আবু তো ভিখিরি ছেলের বাটির ওপর ফেলে দিলে। এ ঠিক তার ভিক্ষা দেওয়া নয়, যেন বন্ধুর সঙ্গে আনন্দের খানিক ভাগ করে নেওয়া। উঁচুতে বসে দান করা নয়, পঙ্‌ক্তি-ভোজনে সমান জায়গায় ঘেঁসাঘেঁসি করে বসা—যেন ঠিক সমবয়সীর মত।

কিন্তু পাতলা এনামেলের বাটিতে টুং করে শব্দ করে উঠতেই—সর্বনাশ! আবুর মুখ গেল কালো, বিবর্ণ হয়ে। ভয়ে মুখ একেবারে আমসির মত শুকিয়ে চিম্‌সে হয়ে এল। কোথায় গেল আকাশের রোদ, কোথায় বা তার অজস্র ঢেউ! সমস্ত অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী নেমে যাচ্ছে রসাতলে। আবুর শরীরে আর এতটুকু বশ নেই। সে এক্ষুনি মাথা ঘুরে মাটির ওপর পড়ে যাবে নিশ্চয়!

সর্বনাশ! পয়সা দিতে ভিখিরিকে সে পকেট থেকে একটা আধুলি দিয়ে ফেলেছে! তার মামিমার আধুলি! সাবানের টাকার ভাঙতি! সেই সাড়ে-দশ আনার আধুলি! সমস্ত রাস্তা-ঘাট দালান-বালাখানা মাঠ-বাজার তার কাছে প্রকাণ্ড একটা সর্ষে ক্ষেত বলে মনে হল। চোখের সামনে কণা-কণা অগুন্‌তি সে হলুদ-ফুল দেখছে। পয়সা আর আধুলির সমান আকারও প্রায়-সমান ওজন থেকেই ফুর্তির বাড়াবাড়িতে তার এই মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন মামিমার কাছে গিয়ে সে কী জবাবদিহি দেবে? নিজে দান করতে গিয়ে পরের ভাণ্ডারে দস্যুতা করবার অধিকার তাকে কেউ দেয়নি। মামিমা এই ক্ষতিপূরণ করবার জন্য তার ওপর লাঞ্ছনার কী বিস্তৃত আয়োজন করবেন ভাবতেই আবুর সমস্ত গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে উঠল।

একটি মুহূর্ত মাত্র। ভিখিরি বাটির মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে আধুলিটা তুলতে যাচ্ছিল, দুর্ধর্ষ ঈগলের মত আবু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে ছোঁ মেরে নিল তার হাত থেকে আধুলিটা ছিনিয়ে।

অন্ধ ভিখিরি প্রবল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—দেখলে, দেখলে বাবু, তোমার পয়সা কে কেড়ে নিয়ে গেল হাত থেকে! কে রে, কে রে পাজি ছোঁড়া, ভিখিরির পয়সা চুরি করে পালাস!

কারো কোন সাড়া-শব্দ নেই।

ভিখিরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলতে লাগল—দেখলে বাবু, সমস্ত সকাল থেকে বসে এতক্ষণে একটি মোটে পয়সা পেয়েছি—তা কে-না-কে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! তোমার সামনে দিয়ে! ওকে বলো না, আমার পয়সা ফিরিয়ে দিক শিগগির! ওকে ধরে থানায় দিয়ে এসো না! দেখ দিকি নখ দিয়ে হাতটা কেমন কেটে দিয়েছে! ওর ভালো হবে নাকি ভেবেছ? ও গোল্লায় যাবে, ও উচ্ছন্নে যাবে, ওর তেরাত্র পোহাবে না—আমি তোমাকে এ দিব্যি করে বলছি!

আবু সস্নেহ স্বরে বললে, ও নিকগে একটা পয়সা। আমি তোমাকে আর-একটা দিচ্ছি। তোমার পয়সা তো তোমারই থাকল। বলে আবু এবার সযত্নে বেছে-বেছে একটি পয়সা বার করলে।

এবার বাটিতে না ফেলে চুপি-চুপি তার হাতের মুঠোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, ভালো করে চেপে ধরো, নইলে কে কখন আবার ছোঁ মারে ঠিক নেই।

ভিখিরি আনন্দে বিহ্বল হয়ে আবুর হাতদুটো চেপে ধরে বলতে লাগল, জয় হোক বাবা! অনেক পরমাই হোক, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! মনে-মনে যা তুমি চাও, তাই যেন তিনি তোমাকে দেন, দিয়ে যেন তিনি আর কুলিয়ে উঠতে না পারেন। তিনি তোমার ভালো করুন! বলে ভিখিরি দুহাত তার কপালে এনে ঠেকালো।

আশীর্বাদ সে পেল বটে, কিন্তু মিথ্যা, ভুয়ো আশীর্বাদ।

সেই থেকে আবুর মন পড়েছে মুষড়ে, বর্ষার আকাশের মত মেঘলা

করে আছে। আসলে সেই আট আনাই ভিখিরির প্রাপ্য ছিল, ডাকাতি করে সে তা লুট করে এনেছে। তার কাছে সে ঐ আট আনা ঋণী—অমন আশীর্বাদে তার অধিকার নেই। তার স্নেহের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার দস্যুতা, তার দানের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার ঋণ।

সমস্ত দিন আবুর মন ভার। ভিখিরির ঐ ধার শোধ করে না দেয়া পর্যন্ত তার মনের এই ঘোলাটে ভাব আর কাটবে না। হ্যাঁ, এখন থেকেই আরম্ভ করা যাক। এখনো তার কাছে জলজ্যান্ত সেই তিনটে পয়সা আছে। আস্তে-আস্তে তার ধার শোধ করে দিতে হবে। এক-আধ পয়সা করে যত দিনে সে পারে।

বিকেলে আবু আবার সেই গ্যাস-পোস্টের কাছে এসে হাজির হল—পকেটে তার সেই বাকি তিন পয়সা।

কিন্তু কোথায় সেই অন্ধ ভিখিরি!

তার পরের দিন—তার পরের দিন, কোনদিন তার আর দেখা নেই। কেনই বা সে এখানে থাকবে? যেখানে তার বাটি থেকে পয়সা নিয়ে পালায়, সেখানে ভিক্ষা করা আর নিরাপদ নয়। হয়ত সেই ভয়েই সে এ জায়গা ছেড়ে উঠে চলে গেছে।

কিন্তু রোজ সমানে দু-বেলা আবু তাকে খুঁজে বেড়ায়। পকেটে তার তখনো সেই তিন পয়সা।

অতিথি

ধারালো ছুরি দিয়ে আকাশের পশ্চিম দিকটা যেন কে ছিঁড়ে দিল। ছিল অন্ধকার, হয়ে গেল অবিচ্ছিন্ন শুভ্রতা।

নদীটা অনেকদিন থেকেই ফুলছে। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ইউনিয়ন-বোর্ডের যে ছ-ফুট উঁচু মাটির বাঁধ ছিল তা তো কবে থেকেই টলমল করছিল, আজ এক ঝলকে তা জলের মুখে শুকনো একটা কুটোর মত ভেসে গেল। ঢেউয়ের দল বিজয়ী, বিক্ষিপ্ত সৈন্যের মত হুড়মুড় করে এসে পড়েছে।

গ্রামের লোকেরা প্রথমটা একেবারে থ হয়ে গেল। এমন একেকখানা মুখ করে এ-ওর দিকে চাইতে লাগল, যেন ব্যাপারটা তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।

কিন্তু কারুর মুখের দিকে তাকাবার তখন আর সময় নেই। জল তখন পায়ের পাতা ছেড়ে হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। কোথায় কার ছেলেমেয়ে, কোথায় কার গোরু-বাছুর, কোথায় কার জিনিসপত্র —কাউকে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার সময় পর্যন্ত দিল না! হাঁটু ছেড়ে জল তখন প্রায় কোমরের কাছাকাছি।

দেখতে-দেখতে সেই জল গলার কাছে উঠে এল, কোথাও সবুজের একটু ছিটে-ফোঁটা রইল না। শুধু জল আর জল—কোথায় গেল ক্ষেত আর মাঠ, পুকুর আর ডোবা, রাস্তা আর সাঁকো, —সমস্ত কিছু শূন্য, সাদা, একাকার। মাঝে-মাঝে কোথাও ঘরের চাল কিংবা গাছের মাথা কেবল উঁকি মারছে। একদিকে জলের যেমন অট্টহাসি, অন্যদিকে শতকণ্ঠে মানুষের আর্তনাদ।

হরিশ তাড়াতাড়ি অধরকে ডেকে নিল। গ্রামের মধ্যে দুর্দান্ত বলতে এদের মত আর কেউ ছিল না। তা মড়া-পোড়ানোই বলো বা

আগুন নেবানোই বলো। ভূত-প্রেতের ভয় তো কোনদিন করেই নি, এমনকি বুকে-হাঁটা আঁকাবাঁকা সে-সব মসৃণ ও সূক্ষ্ম জানোয়ার-গুলোকেও তারা কেয়ার করত না। হরিশ কোমরটা আঁট করে বেঁধে নিল। বললে, চল, শালতি করে বেরিয়ে পড়ি।

অধর অবাক হয়ে বললে, কোথায় ?

জলে, জলের মধ্যিখানে।

অধর মাটির একটা উঁচু টিপির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, কী করতে ?

হাওয়া খেতে নিশ্চয়ই নয়। যদি পারি, দেখি কাউকে বাঁচাতে পারি কি না।

অধরের এটা অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। সে কিনা নিরাপদে একটা উঁচু টিপির ওপর চুপ করে বসে আছে!

আজকের দিনে সামান্য একটা গোরু-ভেড়াকেও যদি বাঁচাতে পারি, তবেই আমাদের বেঁচে থাকা সার্থক, অধর। আয়, নেমে আয়।

তারপর তুজনে তারা জলের মধ্যে নৌকো ভাসিয়ে দিলে। একখানা লগি মাত্র সম্বল, জলের ঘায়ে নড়বড় করছে। অধর বললে, বেশি লোক তো এতে তুলতে পারবিনে হরিশ!

কেন ? কথাটা হরিশ বুঝতে পারল না।

নৌকোটা বেশি মজবুত নয়। বেশি লোক নিতে গেলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা।

তবু যে যতটুকু জায়গা চায়, তাকে তাই ছেড়ে দিতে হবে। আজকের দিনে আর বাছ-বিচার নয়। হরিশ বুক ফুলিয়ে বললে, নিজেদের কথা ভাবছিস ? আমাদের আবার ভাবনা কী ? জলে—জলেই আমাদের যথেষ্ট জায়গা। দিব্যি আমরা সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারব।

সাঁতরাতে অধরও কিছু নেহাৎ পেছপা নয়, কিন্তু এই জলের পার কোথায়! এ তারা কোথায় এসে পড়েছে! মাইলের পর মাইল

দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ একটা শুধু জলের মরুভূমি, একটা অসহ্য উন্মুক্ততা। না আছে এককোঁটা কোথাও আলো, না আছে একটা মানুষের কণ্ঠস্বর। এ সময় কোথাও কারু মুমূর্ষু কণ্ঠে মর্মভেদী একটা আর্তনাদ শুনতে পেলেও যেন ভরসা হত। জলের এই ভয়াবহ নির্জনতায় অধরের মন মুষড়ে পড়ল, সমস্ত উৎসাহ গেল নিবে; হাতের মুঠোয় লগিটা ফস্কে যেতে লাগল বারে বারে।

তবু এটা নদী নয়, ডাঙার ওপরে বন্যার ঘোলা জল ফেনায়িত হয়ে উঠে এসেছে। নদী বলতে তবু যেন আমরা একটা পার বুঝি, সমাপ্তির কোথাও একটা রেখা পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ জলস্তরে কোথাও এতটুকু একটু বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই। কী বা পথ, কোথায় বা পার, দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়ে তুমি তার একটা ইসারা পাবে না। চলেছ তো চলেছই, নদীর মধ্যেই বা এসে পড়েছ কি না তা কে বলবে? দিকে দিকে মত্ত হাতির মত রাশি-রাশি জল শুধু অনর্গল উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।

অধর ম্লান কণ্ঠে বললে, ফিরে চল হরিশ, অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

হরিশ ধমকে উঠল, কী আবার দেখা যাবে? জলের মধ্যে তুই হাতি-ঘোড়া দেখতে বেরিয়েছিস নাকি?

অধর বললে, কিন্তু এই জলে তুই মানুষের সন্ধান পাবি কোথায়? জলের মধ্যে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত কান্নাও ডুবে গেছে, হরিশ।

হরিশ বললে, তাই বলে শুধু-হাতে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারব না, অধর; অন্তত একজন কাউকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোর কাছে নিজের প্রাণটাই যদি বেশি হয়, তবে যা, তোকে ছুটি দিলাম। সাঁতরে চলে যা তোর সেই পিঁপড়ের ঢিবিতে।

এমন কথা হরিশের মত লোকই মুখ ফুটে বলতে পারে। শুধু মরা লোকের ওপরই ওর দায়, জীবন্ত লোকের দিকে ফিরেও চাইবে না।

অধর একবার আকাশের দিকে চাইল। ঠাট্টা করবার আর সময় ছিল না, ঠিক এই সময়ই কিনা চাঁদ উঠেছে!

হঠাৎ কিছু দূরে কি একটা ভারী জিনিস জলের মধ্যে ঝুটোপুটি করছে দেখা গেল।

ঐ! ঐ! হরিশ উঠল উৎসাহে উদ্বেল হয়ে, বললে—তাড়াতাড়ি ঠেলে চল, অধর! মানুষ, মানুষ—জলের মধ্যে অসহায় দুই হাতে কে আশ্রয় খুঁজছে ছাখ!

অধরের ধড়ে যেন এতক্ষণে প্রাণ এল। এই জলের মধ্যে মানুষ যেন একটা মস্ত বড় সম্পদ, এতক্ষণে যেন কাউকে আঁকড়ে ধরা যাবে। নইলে, অধরের কেবলই মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অবাস্তব স্বপ্নের দেশে চলে এসেছে।

তাড়াতাড়ি লগি ঠেলে তারা সেই মজ্জমান লোকটার কাছে এসে পড়ল। দুই হাত তুলে মুহ্যমান সেই লোক অনন্ত আকাশে যেন আশ্রয় খুঁজছে।

অধর বললে, আমি শালতি ঠিক কায়দা করে ধরে আছি, তুই টেনে তুলতে পারবি তো ওটাকে? মস্ত জোয়ান লোক বলে মনে হচ্ছে।

পারব না কী বলছিস! নৌকোর ধার ঘেঁসে হরিশ ঝুঁকে পড়ল, বললে, জলে এখন একেবারে ন্যাতা হয়ে পড়েছে না? একটানে তুলে আনব, দেখিস। আমার হাতে যখন পড়েছে, তখন ও না-বেঁচে যাবে কোথায়? বুঝলি অধর, সৎকাজে সিদ্ধি পৃথিবীতে মিলবেই মিলবে।

এই বলে নিচু হয়ে হরিশ জলের মধ্যে সেই বিপন্নের উদ্দেশ্যে দুই হাত ডুবিয়ে দিলে। জল খেয়ে খেয়ে সেই লোকটা তখন প্রায় একটা নিটোল ঢোল হয়ে উঠেছে, অনেক ধস্তাধস্তি করে অসুরের মত শক্তিতে হরিশ তাকে প্রায় নৌকোর প্রান্তভাগের ওপর তুলে আনল।

কিন্তু এ কী সর্বনাশ!

অভাবনীয়েরও একটা সীমা আছে! হরিশ যে হরিশ, তারও সমস্ত শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—হাতদুটো তার নিজের না আর কারুর অনুভব করার শক্তি রইল না।

যাকে সে টেনে তুলেছে সেটা কোন বিপন্ন মানুষ নয়, জলজ্যান্ত প্রকাণ্ড একটা বাঘ!

অধর আগুনের মত লেলিহান কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—বাঘ, বাঘ! শিগগির ওটাকে ছেড়ে দে, হরিশ!

তার আগেই অবিশ্যি হরিশ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু থাবা দিয়ে নৌকোর একবার নাগাল পেয়ে বাঘ কিছুতেই আর নেমে যেতে রাজি হল না। ঘাড়ে একটা প্রচণ্ড চাড় দিয়ে স্বচ্ছন্দে সে নৌকোর ওপরে উঠে বসল।

দুই বন্ধু ভয়ে জড়াজড়ি করে একেবারে তখন তালগোল পাকিয়ে গেছে। নৌকোর থেকে লাফিয়ে পড়েও যে তখন প্রাণ রক্ষা করা যায়, সেই মুহূর্তে এই সোজা বুদ্ধিটাও তাদের মাথায় এল না। কিন্তু কোথায়ই বা তারা পালাবে বল? চারিদিকে ধাবমান বন্যার জল ফেনিল, উত্তাল হয়ে উঠেছে। যেদিকে চোখ যায়, সে জলের আর কোন লেখাজোখা নেই।

তাদের এই স্তম্ভিত মূর্ছার মধ্যে থেকে বাঘের মুখে তারা একটা ক্ষীণ গর্জন শুনতে পেল। তাকে ঠিক গর্জন বলা যায় না। পশুরা হাসতে পারে না, যদি পারত, তবে এমনিই হয়ত শোনাতো সেই হাসির শব্দ।

সেই হাসির শব্দে সচকিত হয়ে তারা একবার আগন্তুকের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করল। দেখল, বাঘ নিতান্তই ভদ্রলোকের মত কোন-কিছু উৎপাতের সুচনা না করে নৌকোর এক কোনে দিব্যি গ্যাট হয়ে বসেছে।

হরিশ একবার ভয়ে-ভয়ে গলাটা খাঁকরে নিলে। বললে, একী, চুপচাপ করে বসল দেখি নৌকোর ওপর!

অধর কাঁপতে কাঁপতে বললে, তবে ঘাড়ের ওপর বসলেই তুই খুব খুশি হোস নাকি ?

হরিশ না নড়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, সত্যি এটা বাঘ তো রে অধর!

তাকে একটা ঠেলা দেবার ভান করে অধর বললে, যা না, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে পরখ করে গ্যাখ্ না গিয়ে।

হরিশকে অবিশ্যি তাতে রাজি করানো গেল না। বললে, কিন্তু এ কী তপস্বীর মত ব্যবহার!

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর না,—অধর যেন জলের তলা থেকে কথা কইল, দেখবে তখন তার লকলকে জিভের ধার। জলে নেতিয়ে পড়েছে বলেই এখন একটু হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছে মাত্র। একটু দম নিয়ে নিক, তারপর তাকে আর আমাদের দেখতে হবে না।

এত ভয় পাচ্ছিস কেন? হরিশ ততক্ষণে নিজেকে আবার সামলে নিয়েছে, বললে, বেশি কিছু তেড়িবেড়ি করলে শালতিটা তখুনি উল্টে দেব না? বাছাধন যাবে কোথায়!

সে যেখানেই যাক, আমরাই বা কোথায় যাব?

ওটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা আবার নৌকোর ওপর চড়ে বসব। হরিশ হেসে উঠল, বললে—জলে ও আমাদের সঙ্গে পারবে নাকি? ও সাঁতরাতে জানে?

জল-স্থলের এই চেহারা দেখে মানুষ যে কী করে হেসে উঠতে পারে অধর কিছুতেই ভেবে পেলো না। কপালের ঘাম মুছে শুকনো গলায় বললে, তার চেয়ে প্রাণ থাকতে ভালোয়-ভালোয় এক্ষুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি না! তবু মনে হচ্ছে, জলেই বরং বাঁচবার যাহোক কিছু আশা আছে, অন্তত খানিকক্ষণ সাঁতার কাটা যাবে, কিন্তু ও একবার খাড়া হয়ে দাঁড়ালে আর আমাদের রক্ষে নেই। তাই কর হরিশ, জলেই আমরা লাফিয়ে পড়ি।

হরিশ আবার হেসে উঠল, বললে, তাহলে ও বেচারির কী দশা হবে? অসহায় হয়ে আমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে, ওকে ত্যাগ করা কি ধর্ম হবে?

এ কী উৎকট রসিকতা! অধরের প্রায় কেঁদে ফেলবার জোগাড়।

তার একটা হাত চেপে ধরে হরিশ বললে, ভয় কী? দেখছিস না কেমন ওর একটা নিরীহ ভিজে-বেরালের চেহারা! বোধহয় আসামী বাঘ।

আসামী বাঘ! সে আবার কী?

আসামী বাঘ মানুষ খায় না। হেট্‌ বললে গোরু-ছাগলের মত সরে দাঁড়ায়।

অধর ঝাঁঝিয়ে উঠল, দামোদরের বন্যায় আসামের বাঘ আসবে কোত্থেকে?

বলা যায় না,—হরিশ প্রশান্ত, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, নইলে এতক্ষণ ভালো মানুষের মত চুপ করে বসে আছে! ভয় কী, দেখাই যাক না কদ্দুর গড়ায়! আমরা দুজনে আছি, হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি আছে, চারদিকে থইথই করছে জল, ব্যবস্থা একটা হবেই। ভোর হতে আর দেরি নেই।

তা নেই, কিন্তু অধরের মনে হল, সেই ভোর আর তার ইহ-জীবনে দেখা হল না।

হরিশ তাকে অভয় দিয়ে বললে তুই নাহয় আমার পেছনে গিয়ে বোস, যদি ওৎ পাতে আমিই আমার গলাটা আগে বাড়িয়ে দেব।

বসবার কথা অধর ভাবতেও পারে না! দুই পায়ে কঠিন হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

নিশ্বাস গুনে-গুনে অধরের মনে হল, অনেকক্ষণ কেটে গেছে, কিন্তু বাঘের কোন সাড়া-শব্দ নেই। শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত।

অধর ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

হ্যাঁ, ওর আবার ঘুম! হরিশ গভীর অবজ্ঞাভরে বললে, খিদের জ্বালায় নিজের হাত কামড়াচ্ছে!

বলিস কী ভীষণ কথা!

মোটেই ভীষণ নয়, কথাটা বরং আরামের, অধর। আমার অনুমানই ঠিক, ওটা মানুষখেকো হলে এমন সুখাদ্য ফেলে কখনো নিজের থাবা চুষত না। হরিশ তারও চেয়ে উদাসীন গলায় বললে, বিপন্নকে শুধু আশ্রয়ই দিতে পারলুম, অধর, আহার্য দিতে পারলুম না।

অধর অস্থির হয়ে বললে, তার চেয়ে আমাকে আগে পারে তুলে দিয়ে তুই ওর সেবা-শুশ্রূষায় মন দে, আমি আপত্তি করব না। তুই কী কেবল একই জায়গায় শালতি নিয়ে ঘোরফেরা করছিস, সামনে টেনে চল্ না!

পাগল! কথাটা হরিশ যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। বললে, এখন জলের এই মধ্যিখানটাই তো আমাদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ। এখন কি আর পারের দিকে নৌকো নেয়া যায়? আগে ভোর হোক, ওর চরিত্রটা একবার ভালো করে বুঝি। পরে, সেই অনুসারে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

সত্যি, বাঘের দিক থেকে বিন্দুমাত্র সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে-মাঝে বিরাট একেকটা হাই শুধু সে আকাশের দিকে প্রসারিত করে ধরছে।

তারপর আস্তে-আস্তে সত্যি ভোরের আলো ফুটল। সেই আলোতে অধরের মন বিশেষ খুশি হয়ে উঠল না, কেননা সেই বাঘের গায়ের সমস্ত কটা হলদে ডোরা একসঙ্গে জ্বলজ্বল করে উঠেছে!

তবু রাতের আধো-জ্যোৎস্নায় খানিকটা তার অচেনা ছিল। এখন তার গায়ের গন্ধটাও যেন স্পষ্ট, তীব্র হয়ে উঠেছে। অধর হরিশের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁচু হয়ে তার দিকে একবার উঁকি মারল,

কিন্তু বলতে কী, তার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতায় ভরো-ভরো বলে মনে হল না। তার মুখশ্রীতে এতটুকু বিনয় নেই, বসবার ভঙ্গিতে নেই এতটুকু ভব্যতা তার হাইগুলিও বিশেষ সলজ্জ নয়।

হরিশ রসিকতা করে বললে, কী বাঘ, আমাদের খাবে?

বাঘ চারিদিকের রাশীভূত জলের দিকে চেয়ে পরিমিত হাই তুলে জিভ দিয়ে গোঁফটা একবার লেহন করল।

অধর হরিশের পিঠটা আঁকড়ে ধরে বললে, কী হবে!

কী আবার হবে। দেখতে পাচ্ছিস না ঐ জলের ওপর রসপুর গ্রামের শিবমন্দিরের চুড়ো? এ সব তো আমাদের চেনা জায়গা।

জায়গাটা তো চেনা, কিন্তু সঙ্গীটি যে ভীষণ অপরিচিত!

হোক, আমি ওর সঙ্গে ভাব করব। হরিশ নিশ্চিন্ত গলায় বললে, তোর যদি সাহসে না কুলোয় জলের মধ্যে তবে তুই পা ডুবিয়ে বসে থাক, প্রথম ধাক্কাতেই লাফিয়ে পড়তে পারবি। আমার হাতে জাদু আছে। এই বলে লগিটা সে তুলে রাখল।

নৌকো আর বাইছে না দেখে বাঘ কাঁইকুঁই করে উঠল। দীর্ঘ শরীর আপ্রান্ত প্রসারিত করে সে আলস্য ভাঙলে। তারপর থাবা দিয়ে গোঁফটা একটু পরিপাটি করে নিয়ে ধীরে পায়ে নৌকোর পাটাতনের ওপর ছোট-ছোট বৃত্তাকারে পায়চারি শুরু করল।

অধরের কথা আর কিছু বলব না। কিন্তু ব্যাঘ্রবর যখনই এদিকে ঘুরে আসছে, অধরকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হরিশ বলছে,—দেখো বাবা বাঘ, ভীষণ অধর্ম হবে। জলে তলিয়ে যাচ্ছিলে, কৃপা করে আশ্রয় দিয়েছি; মহত্ত্বের অমর্যাদা কোরো না। বেশি কিছু বেয়াদবি কর তো, দেখছ এই জল, হরিবোল বলে ভাসিয়ে দেব। গুহায় বসে ছেলেপুলেগুলি কেঁদে মরবে। দোহাই বাবা, পশু হয়েছ বলে একেবারে মানুষের মত পশু হয়ে যেয়ো না।

বাঘ সেই অনুরোধের সারার্থ যেন বুঝতে পারল। বারে-বারে সামনে দিয়ে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু লোভ যে কী পদার্থ সে-

সম্বন্ধে তার এতোটুকু চেতনা নেই। চারিদিকে জল ছাড়া কিছুই যেন সে আর দেখতে পাচ্ছে না। মানুষ আবার এমন কী একটা বিস্ময়কর জিনিস!

তারপর বার বার চতুর্থবার যখন সে ওদের প্রায় গা ঘেঁসে যাচ্ছিল, তখন হরিশ দিব্যি তার পিঠের ওপর আদর করে ছোট্ট একটা চাপড় মারলে।

বাঘ সেই সস্নেহ স্পর্শটুকুও পরম ঔদার্যে গ্রহণ করল।

হরিশ উৎসাহে লাফিয়ে উঠল, বললে,—এ আসামেরও বাঘ নয়, অধর, এ নিতান্তই আমাদের মিনি-বেরালের বড় বোন-পো। তোর আর কিছু ভয় নেই, আমি ওকে পোষ মানাবো।

হরিশের সেই ছুঁতেও অধরের সমস্ত শরীর কালিয়ে আসছে। কিন্তু সত্যি, ভয় কোথায়! হরিশ আবার তার গায়ের ওপর দিয়ে ঘন করে হাত বুলিয়ে দিল।

দে তো শিগগির, পাটাতনের তলায় মোটা একটা দড়ি আছে —হরিশ দীপ্ত কণ্ঠে বললে, একটা ফাঁস জড়িয়ে ওর গলাটা এবারে বেঁধে ফেলি!

আশ্চর্য, দড়িটা অধর হরিশের হাতে তুলে দিল।

বাঘ যখন এবার ওদের গা শুঁকে ঘুরে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুখে হরিশ দড়িতে একটা ফাঁস গেরো করে নিয়ে বাঘের গলায় নির্ভুল কায়দা করে ছুঁড়ে মারল। চেঁচিয়ে উঠল, শালতি টেনে চল, অধর, বাঘ ধরা পড়েছে। সত্যি সত্যি, বাঘের গলায় দড়ির বকলস। তার এক প্রান্ত হরিশের হাতে ধরা।

বাঘ যেন তাতেও ভ্রূক্ষেপ করল না। নৌকোটা ফের চলেছে দেখে নিজের জায়গায় বসে পরম স্বস্তিতে নিশ্চিন্ত মনে সে হাই তুললে।

হরিশ হাতজোড় করে বললে, কিছু মনে কোরো না বাবা। কী করব বল, আমার বন্ধুটি ভারি ভীতু। তা ছাড়া তোমাকে দেশে নিয়ে গিয়ে নাচ দেখাতে পারলে দু-পয়সা রোজগার হবে। তুমি

যে এমন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, তা আগে কে জানত বল? উঃ, কী ভয়টাই তখন পাইয়ে দিয়েছিলে!

বাঘ এমন একখানা করুণ মুখ করে রইল, যেন এতে তার কিছুই মনে করবার নেই।

তখন বানের জলে আস্তে আস্তে টান ধরেছে। ফুটে উঠছে তখন ঘোলা জলের স্তর। এর ওর সন্ধানে দু-একখানা করে নৌকোও তখন এদিকে-ওদিকে বেরিয়ে পড়েছে।

নিতাই পালের নৌকো একেবারে এদের গা ঘেঁসে এসে হাজির। কিন্তু আরোহীর চেহারা দেখে তার চক্ষু তখন একেবারে চড়ক-গাছ!

এ কী ভয়ানক! নিতাই পালের নৌকো প্রায় উলটে যাচ্ছিল, এমনি আচমকা সে একটা লাফ মারলে। বললে, এ করেছিস কী, হরিশ!

হরিশ হো হো করে হেসে উঠল, বাঘ ধরেছি। কাউকে-না-কাউকে বাঁচাবো প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলুম। শেষকালে জ্যান্ত একটা বাঘ ধরে নিয়ে চললুম, নিতাই।

এ কী সর্বনেশে কথা! নিতাই ভয়ে প্রায় বোবা হয়ে গেল। বললে, সমস্ত দেশ যে উজোড় করে দেবে!

তারই জন্যেই তো গলায় ওর এই শিকল বাঁধা। তারই জন্যেই তো আমরা এখনো সুস্থ দেহে বাঘের সঙ্গে বন-জঙ্গলের খোশ-গল্প করছি। হরিশ আরেকটা হাসির ঢেউ তুলল, বললে,—এতদিন শুধু বাঁদর আর ভালুকেরই নাচ দেখেছিস, এবার বাঘ-নাচ দেখবি।

বাঘ-নাচ দেখব কী রে! নিতাই হতভম্বের মত বললে, তার চেয়ে থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে খবর দিইগে। তিনি এসে তাঁর বন্দুক দিয়ে ওটাকে সাবাড় করে ফেলুন।

খবরদার নিতাই! হরিশ প্রবল কণ্ঠে ধমকে উঠল। অতিথির গায়ে আমি কাউকে হাত তুলতে দেব না। সাবাড় করে ফেলবার জন্যেই ওর গলায় এই মালা পরিয়েছি কিনা!

নিতাইয়ের প্রস্তাব বাঘেরও বিশেষ মনঃপুত হয়নি। সে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে অগ্নিময় একটা গর্জন উদ্গীরণ করলে।

নিতাই তখুনি নৌকো নিয়ে এক ঠেলায় একেবারে খাল-বিল পার হয়ে গেল।

হরিশ হাততালি দিয়ে বললে, জীতা রহো বেটা!

বাঘ আবার প্রভুভক্তের মত স্বস্থানে উপবেশন করলে।

হরিশ বললে, বনের জীব হলে কী হয়, এমন একটা বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করলুম, ভোলে কী করে! দেখিস না, এমন বাধ্য করে তুলব, হাত-পা তুলে ধুলোয় শুয়ে গড়াগড়ি দেবে। এমন সুসভ্য বাঘ আর তুই কোথাও দেখিসনি। আসামী বাঘ এমনি ভদ্রলোক হয়!

অধরের মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। সে বললে, কিন্তু গর্জনটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, যেন প্রায় আসাম থেকেই শোনবার মত!

বাঘের যদি গর্জনও না থাকবে, তবে আর ওর রইল কী? রক্তও খাবে না, লাফও দেবে না, তার ওপর যদি গর্জন করতেও বারণ করিস, তবে ওকে ভেড়া বানিয়ে রাখতে চাস নাকি? হরিশ ব্যস্ত হয়ে বললে,—নে আর ছেলেমানসি করিসনে, এবার জোরে বেয়ে চল। দিব্যি রোদ উঠে গেছে। বেচারি হয়ত কতদিন খেতে পায়নি। ওর জন্যে আবার ছাগল-ভেড়া জোগাড় করে আনতে হবে। মড়কের মড়া খাবে কি না কে জানে? যে রাজপুত্তুরের মত চেহারা!

অধর বললে, কোথায় নিয়ে শালতিটা ভেড়াবো বল।

হরিশ বললে, আমড়াপাড়ার শ্মশানের ঘাটে। ওধারটা নির্জন আছে। নইলে গাঁয়ের ধারে গেলে ছেলে বুড়ো হয়ত ভয় পেয়ে ঢিল মারতে শুরু করবে। ওদের শোক-দুঃখের মাঝে আর ভয়ের উপদ্রব ঘটিয়ে কাজ নেই।

অধর সেই অনুসারে নৌকো নিয়ে চলল। পৃথিবীতে জল ভালো কি স্থল ভালো এ সম্বন্ধে এখনো সে নিঃসংশয় হতে পারেনি।

পাড়ের কাছাকাছি এসে দড়ি-হাতে হরিশ আরেকবার আবেদন করলে—বিদেশে লোকালয়ে নিয়ে যাচ্ছি, বাবা, সভ্য শিক্ষিত মানুষের মত আচার-ব্যবহার কোরো। কেউ যেন কিছু নিন্দে করতে না পায়।

বাঘ বিরাট একটা হাই তুলে সম্মতি জানালে।

নৌকোর মুখটা অধর খানিকটা আগে থাকতেই উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিলে। বললে, বাঘ নিয়ে তুই আগে-আগে নেমে যা, হরিশ। আমি লগি হাতে পেছন-পেছন আসছি।

নিশ্চয়। হরিশ পাড়ের কাছে হাঁটু-জলে লাফিয়ে পড়ল। হাতের দড়ি ছোট করতে-করতে বাঘের গলায় সে ধীরে একটা টান দিয়ে বললে, আর কী, ছুটি হয়েছে। ফার্স্ট বেঞ্চির ভালো ছেলের মত গুটি-গুটি এবার নেমে এস। তোমার দুধ-ভাতের আবার জোগাড় করতে হবে তো!

বাঘ আড়মোড়া ভেঙে বাধ্য ছেলের মত থুব-থুব খাবা ফেলে জলটুকু পেরিয়ে গিয়ে ডাঙার নাগাল পেল কি না পেল—অমনি—

অধর ছিল পেছনে, কিন্তু মুহূর্তে তার চোখের ওপর কী যে কাণ্ডটা ঘটে গেল সে কিছু দিশে করতে পারল না।

বিন্দুমাত্র বাক্যব্যয় না করে বাঘ হরিশের ডান পা-টা আলগোছে মুখে তুলে নিয়েছে এবং হরিশের শত সদুপদেশ সত্ত্বেও প্রশান্ত উদারতায় তাকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

মুহূর্তে অধরের চোখ অন্ধকার হয়ে এলেও মাথায় আগুন উঠল জ্বলে ও শরীরে এল দানবের শক্তি, অসুরের সাহস। পাড়ের থেকে বাঘ তখনো এগোয় নি, এমনি তার প্রলোভনের প্রচণ্ডতা! অধর সেই অনুত্তম মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে হরিশের একটা হাত চেপে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দড়িটা। দুই হাতে দুজনকে টানো

তোমার যত শক্তি আছে, যত তোমার দুর্দান্ততা! ফল হল এই, হরিশ ও বাঘ দুজনেই জলের মধ্যে এসে পড়ল।

অধর অবশ্যি সেইখানেই ক্ষান্ত হল না, হরিশকে আরেক টানে নৌকোর ওপর তুলে ফেললে।

বাঘ তখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে, আর তার সেই তপস্বীর গাম্ভীর্য নেই। আসাম ছেড়ে সিয়াম থেকে শোনা যায় এমন একটা প্রবল প্রতিবাদ করে সেও নৌকোর ওপর উঠে এল।

কিন্তু অধরের হাতের লাঠিব ঠেলা খেয়ে নৌকো তখন জলের আশ্রয়ে চলে এসেছে।

ব্যাঘ্রবরের আবার সেই ধ্যানময় নিষ্কাম মূর্তি। সংসারে সমস্তই অনিত্য—মুখ-ভাবে এমনি একখানা ধর্মোদ্দীপক গাম্ভীর্য।

তার দিকে রক্তাক্ত পা বাড়িয়ে হরিশ বললে, এ কী কীর্তি করলে বল তো? এই কি তোমার নাচের প্রথম নমুনা নাকি?

জলের দিকে তাকিয়ে বাঘ নিস্ফল একটা হাই তুললে। আরেক ঠেলায় নৌকোটাকে আরো একটু এগিয়ে দিয়ে দুই বন্ধু পলকের মধ্যে জলের তলায় লাফিয়ে পড়ল।

অধর বললে, এই কি তোমার আসামের চেহারা? পায়ে গড় করি বাবা!

হরিশ বললে, তোমাকে দুধ-ভাত খাওয়াতে যাচ্ছিলুম, এবার ঠেসে খুব করে জোলো হাওয়া খাওগে যাও।

বাঘ তাদের নৌকোয় ফিরে যাবার জন্যে অভয় দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে একটা গর্জন করলে।

বিকেলবেলা

তোমরা টুটুকে চেন না? খুব ভালো স্কিপ করতে পারে। হলে কী হবে—ক-দিন থেকে ওর ভারি জ্বর। প্রলাপ বকছে :

পশমের জামা পরে পিসিমা ঘুমাচ্ছে,
মেঘের রুমাল নাকে আকাশটা হাঁচছে,
চড়ে ভাঙা ট্যাক্সি
উড়ে চলে খ্যাঁকশি-
য়ালটা ;
পিসিমাও বাইকে
ছোটে নিয়ে ভাইকে
পালটা।
দূর থেকে দেখা যায় Monte Carlo
ঘুম-ঘুম নিঝ্‌ঝুম—মনটি কাড়লো।

যমে-মানুষে টানাটানি—টুটুকে হায়রান করে ছাড়লে। পঁয়ত্রিশ দিনে ওর জ্বর নামল—জানলায় বসে-বসে এখন কবিতা বানায়। ডাক্তার এসে বলে গেল রোজ বিকেলে হাওয়া খেতে বেরুতে হবে,—গাঁয়ের হাওয়ায় গায়ে আভা ফুটবে।

টুটুরা থাকে পশ্চিমে,—ওর বাবা সেখানে মস্ত চাকুরে। ওর বাবা তাঁর ছ-সিলিণ্ডার মোটর-গাড়ি ছেড়ে দিলেন,—টুটুর কিন্তু এক্কাই পছন্দ। আসন-পিঁড়ি হয়ে গাড়ি চড়বে—দড়ির গদিতে বসে।

বিকেলবেলা টুটু একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে—তারই গল্প বলছি।

গাড়িতে আর কেউ নেই—টুটু আর তার মা। এক্কাওয়ালা এদের পরিচিত—পথ হারাবার ভয় নেই।

ফাঁকা গাঁয়ে গাড়ি গড়িয়ে পড়েছে—আঁকাবাঁকা রাস্তা, শাড়ির পাড়ের মত। দিনের আলোর পদ্ম তখন বুজে এসেছে,—আকাশ

মলিন, ঘুমো চোখে চেয়ে আছে। পল্‌কা পাখার ঝাপট দিতে-দিতে সবুজ পাখির ঝাঁক উড়ে চলেছে—কোথায় তাদের নীড় কেউ জানে না। একটা পথহারা গোরু করুণ স্বরে রাখাল ছেলেকে ডাকছে—ঘরে ফিরে যেতে।

বাইরে বেরিয়ে টুটুর ফুর্তি আর ধরে না। একটা ছিপি-খোলা সোডার বোতলের মত ওর পেট থেকে হাসির ফেনা উঠছে। সেজেছেও চমৎকার! পাঁচ বছরের মেয়ে টুটু—মনে হয় যেন একটি শিশু-পরী—মেঘের ভেলায় ভেসে মাটির দেশে পা রেখেছে! এসেন্সের গন্ধে বিকেলের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

খানিকদূর এগিয়ে গাড়িটা যখন একটা শিমুল গাছের তলা দিয়ে বাঁক নেবে, অমনি একটি বছর-আটেকের ভিখিরি ছেলে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। দুপুর থেকেই ছেলেটি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, কিন্তু একটিও পয়সা হয়নি। হঠাৎ ওর দুই কাহিল, শীর্ণ হাত প্রসারিত করে কেঁদে উঠল,—আমাকে কিছু ভিক্ষে দাও মা, আজ দুদিন কিছু খেতে পাইনি।

অর্ধনগ্ন বিকলাঙ্গ কুৎসিত ছেলেটার হাড়-বেরুনো মুখের পানে চেয়ে টুটুর মা মুখ কুঞ্চিত করলেন।

টুটু কলরব করে উঠল,—ওকে কিছু দাও মা, দুদিন ও কিছু খেতে পায়নি!

মা শাসনের স্বরে ধমক দিয়ে বললেন, না!

টুটু বললে, না-খেয়ে থাকলে ভীষণ ক্ষিদে পায় মা! আমি এতদিন জ্বরে ভুগলাম, মনে হচ্ছিল বোধহয় একটা পাহাড় গিলে ফেলতে পারি! আমি তবু তো রোজ হরলিকস্‌ খেয়েছি, বেদানার রস—ও তো তাও খায়নি বলছে।

মা বললেন, ওর মোটেই ক্ষিদে পায়নি।

তবে ও মিথ্যে কথা বলছে?

তা ছাড়া আর কী? ছেলেটা ভণ্ডামি শুরু করেছে।

টুটু বললে, কিন্তু কেমন সুর করে বলছিল! ও বোধহয় বেশ গাইতে পারবে। গাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে চল না মা, ওর গান শুনব!

মা ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, দূর বোকা!

গাড়ি তখন শিমুল-তলার বাঁক ঘুরে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। টুটু জিজ্ঞেস করলে, ওর—ছেলেটির বাড়ি কোথায় মা? সন্ধে হয়ে গেল, ওর মা ভাববে না ওর জন্যে?

মা এই কথা শুনে একবার একটু চমকে উঠলেন। ওঁর হঠাৎ মনে হল, টুটু আর বাড়ি নেই, কোনদিন ফিরবেও না। মায়ের আর্তনাদ শুনেও আকাশ বধির, নিরুত্তর। এই যদি হয়, তাহলে? টুটুকে তিনি বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, ঐ দেখ টুটু। কেমন একঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে।

টুটু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের মত হাত তুলে ডাকতে লাগল—

বগুলা বগুলা, দুধ দে।
সাগরগোটি লে লে।

তারপর মাকে বললে, ওদের বাড়ি কোথায় মা?

মা বললেন, কত দূর! কত বন পাহাড় পেরিয়ে, কোন্ নদীর ধারে, কে জানে!

ওরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, না মা? সবাই বাড়ি ফিরছে এবার। কিন্তু ঐ ছেলেটি এখনো যায়নি কেন? ও কি রাত হয়ে গেলেও ভিক্ষে করবে? ওকে কিছু দিলে না কেন মা?

মা টুটুর রোগা অথচ সুন্দর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। ভিখিরি ছেলের করুণ মুখের ছায়াটি যেন মেয়ের মুখের ওপর এসে পড়েছে। মা ভাবছেন, পথের মাঝে আর কোন ভিখিরির দেখা পেলেই তাকে কিছু দিয়ে দেবেন। ঐ ছেলেটিকে দেননি বলে কী হয়েছে! সবাইকেই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সবাইকেই যদি দিতে হয়, তাহলে ফতুর হতে আর বাকি থাকে না। বিধাতাও এত বড় দাতা নন।

টুটু বললে, আচ্ছা মা, আমি যদি ভিখিরি হতাম, তাহলে আমিও ওরকম নোংরা কাপড় পরে পথে বসে কেঁদে কেঁদে ভিক্ষে চাইতাম? আমাকে তখন তুমি চিনতে পারতে? আমাকে তখন তোমার সব কিছু দিয়ে দিতে, না?

মার বুক শিউরে উঠল। কে জানে, আজ নাহয় ওরা গাড়ি চড়ছে—একদিন যদি ওদেরই বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে যায়! ভাগ্য যদি একদিন মুখ কালো করে তাড়না করে—লক্ষ্মী যদি পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে আর ফিরে না আসে! কে বলতে পারে—টুটু যদি একদিন এই ভিখিরি ছেলেটির মতই গৃহছাড়া আশ্রয়হীন হয়ে এমনি করে দুর্বল মুঠি মেলে ধরে!

মন থেকে এইসব কুভাবনা দূর করে দিয়ে মা বললেন, ঐ দেখ—এক—দুই—তিন—কেমন সুন্দর তারা ফুটে উঠছে! কালো পাথরের থালায় যেন রুপোর টুকরো!

টুটু ফের তার হাতদুটি তুলে উঠল। চার, পাঁচ, ছয়, সাত—ঐ যে—ঐ যে! গোনা যায় না! ওরা কারা, মা?

খোকাখুকুর চোখ।

মাটির খোকাখুকুর?

হ্যাঁ।

টুটু খুশিতে চোখ বড় করে বললে, তাহলে আমার চোখও আছে ওখানে?

মা বললেন, হ্যাঁ, ঐ যে। বলে সন্ধ্যাতারাটি দেখিয়ে দিলেন।

টুটু বললে, ঐ ভিখিরি ছেলেটির চোখ আছে মা আকাশে? না, ও ভিখিরি বলে ওর চোখ ওখানে নেই?

মা ঢোক গিলে বললেন, আছে।

টুটু আগ্রহে অধীর হয়ে বললে, কই?

মা আঙুল দিয়ে খুশিমত আরেকটি তারা দেখিয়ে দিলেন।

টুটু নরম ঘাড়টির সঙ্গে কোঁকড়ানো চুলগুলি একটু এগিয়ে কাত করে বললে, হ্যাঁ, তাই ও-তারাটি বুঝি কাঁদছে, না মা ? ভারি ছলছল করছিল ওর চোখ, দেখেছ ?

গাড়ি তখন চলেছে বুড়ো শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে।

টুটু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওগুলি কী মা ?

মা বললেন, কুঁড়ে ঘর।

কারা থাকে মা ওখানে ?

যাদের পয়সা নেই, গরিব।

টুটু মুখ ভার করে বললে, ভিখিরি-ছেলেরাও এমনি ভাঙা ঘরে থাকে ? ওদের মা আছে ওখানে ? খেতে না পেলে ওদের ঘুম আসে ? ঝড়ে ওদের পাতার চাল উড়ে যায় না ?

যায় বৈকি।

টুটু অবাক হয়ে বললে, চাল উড়ে যায় ? তাহলে ওরা কী করে ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে ? ভিক্ষে করতে বেরুলেই ভিক্ষে দিতে কেউ বেরোয় না। কোথায় থাকে মা, তখন ওরা ?

গাছতলায়,—পথের পাশে।

তখন ওরা সোজা আমাদের বাড়িতে চলে আসে না কেন ? আমাদের বাড়িতে চাকরদের ব্যারেকটা তো একদম খালি পড়ে আছে।

মা এবার দস্তুরমত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর। বকবক কোরো না। দুষ্টু মেয়ে !

টুটু তক্ষুনি অভিমানে মুখখানি ফুলিয়ে রইল। এ মুখখানি যেন অনেকটা সেই ছেলেটির মত। তেমনি একটি ম্লান অভিমান চোখের তারায় কাঁপছে।

মার মনে হল, তিনি তো একদিন এমনি কত আকুতি-মিনতি করে বিধাতার কাছে টুটুর জীবনভিক্ষা চেয়েছেন। বিধাতা যদি এমন ঘাড় বেঁকিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেন! যদি হাতের মুষ্টি শিথিল না করতেন!

মা তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন, গাড়ি ফেরাও সেই শিমুলতলায় যেখানে ভিখিরি ছেলেটি বসে ছিল। শিগগির।

গাড়ি ফিরে চলল।

অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধে আসছে।

টুটু ভারি খুশি হয়ে মার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বললে, আমাকে দাও না মা টাকাটা। আমি টাকাটা ভিখিরি-ছেলের হাতে গুঁজে দেব, ভারি খুশি হয়ে আমাকে দেখবে। আমার এই লাল ফ্রকটার দিকে—এই চুলের রিবনের দিকে চেয়ে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবে, না?

টুটুর সঙ্গে-সঙ্গে মাও গাড়ি থেকে গাছের তলায় নেমে এলেন। দূরে মাঠের শেষে শেয়ালরা হল্লা শুরু করেছে। পাশে একটা বেতের ঝোপ থেকে ঝিল্লীরা শব্দ করছে অবিশ্রান্ত। কতগুলি বুনো ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে।

মা ও টুটু দুজনে অন্ধকারে একটুখানি এপাশ-ওপাশ খুঁজল, গাছের তলায় কাউকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

টাকা হাতে করে ম্লান মুখে টুটু আস্তে আস্তে গাড়িটায় গিয়ে উঠে বসল। তার চোখদুটি নাম-না-জানা দূর তারার মত ছলছল করছে।

মিনুর বাহাদুরি

দাদার কাছে পদে-পদে এই হার আর মিনু কিছুতেই সইতে পারছে না। দাদা যা খুশি চাল দিয়ে বেড়ায়, আর সে তার ইস্কুলের বিষয়ে একটা কোন গল্প ফাঁদতে গেলেই সবাই তাকে হেসে উড়িয়ে দেয়, তার কোন কথায় কেউ একবিন্দু উৎসাহ দেখায় না। মেয়ে বলে তার অনেক দুর্গতি। দাদা এবার ফোর্থ ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে বড়-ইস্কুলে উঠে গেছে—এখন থেকে তাকে দস্তুরমত গাড়ি ঘোড়া বাস মোটর বাঁচিয়ে ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয় বলে তার কী আদর! আর সে কিনা এখনো জুজুর ভয়ে গাড়িতে চড়ে ইস্কুল করছে! তাকে দিয়ে পৃথিবীর কোন্ কাজটা হবে শুনি? দাদা একদিন এরোপ্লেন চড়ে বিলেত যাবে, আর সে বাড়িতে বসে বসে উনুন ফোঁয়াবে, বার্লি জ্বাল দেবে, কাঁথা সেলাই করবে—মা তো অহর্নিশ এই বলেই বকে চলেছেন। যেখানে দাদার জন্যে আসছে একটা ফাউন্টেন পেন, সেখানে তার জন্যে বড়জোর একগজ রিবন, দাদার জন্যে যেখানে দু-আনার টিফিন, সেখানে তার জন্যে বরাদ্দ মাত্র একপয়সার আলুকাবলি। কিছু বলতে গেলেই মা ধমকে ওঠেন,—ও ছেলে, ও বড় হয়ে কত পয়সা রোজগার করে আনবে। তোরা মেয়েরা তো খালি শুষে নিস—তোদের জন্যে যা খরচ, সে তো কেবল জলে ফেলা।

কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে এই অপমান মিনু আর সইতে পারছে না। সে বড় হতে পারবে না, এমন কোন কথা আছে নাকি? ক্লাসের পরীক্ষায় এবার তো সে সেকেণ্ড হয়েছে। দাদা ছুটে এসে বললে, জানি, দুজনের মধ্যে তো? আজ্ঞে না, তাদের ক্লাসে গোনা-গুনতি বত্রিশটি মেয়ে। দাদা তবু নিরস্ত হবে না, টিপ্পনি কেটে বলবে—ভারি তো তোদের স্ট্যাণ্ডার্ড—একশোর মধ্যে কুড়ি পেয়ে ফার্স্ট হয়! আমাদের ছেলেদের কথায় তাকে সোজাসুজি ফেল করা বলে।

দাদার সঙ্গে কথায় সে পেরে ওঠে না, তাই অগত্যা সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে বসে। দাদা তক্ষুনি ঠাট্টা জুড়ে দেয়—মেয়েরা কেবল কাঁদতেই পারে, আমরা হলে কাজে দেখিয়ে দিতুম। কিন্তু ঐ কান্না আর এস্রাজ বাজানো ছাড়া তোরা আর কী করতে পারিস, সত্যি করে বল দিকিনি?

ইস! মেয়ে হয়েছে বলে মিনু তো অমনি ভেসে আসেনি! বয়সে না হোক, দাদার চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়, তার হাতেও পাঁচটা করে আঙুল আছে। বেশ, তাই সে প্রমাণ করবে। পড়ে পড়ে সে আর দাদার বিদ্রূপ সইবে না। বাড়িতে যত আদর দাদাকে, আর শাসন ফলাবার বেলায় এই মিনু! তাকে দিয়ে বাবা-মার টাকা-পয়সার দিক থেকে কোন লাভ নেই, সে তাই একটা খোলামকুচির সমান। আচ্ছা, মিনু দেখে নেবে, কাঁচের মত সে ঠুনকো নয়, মনে-মনে তার অসীম জোর।

সেদিনের ব্যাপারটা ভারি সঙিন হয়ে দাঁড়ালো। মিনুদের গানের শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর বিদায় নেবার উপলক্ষে মেয়েদের দিয়ে ছোটখাট একটা নাচ আর ট্যাবলো হবার কথা। মিনুর অবশ্যি একটা পার্ট আছে। এবং তাদের হেডমিস্ট্রেস বলে দিয়েছেন যে, যারা প্লে করবে তারা যেন একখানা করে নতুন ধোলাই শাড়ি নিয়ে আসে—রঙে ছুপিয়ে নিতে হবে। অতএব মিনুর একখানা নতুন শাড়ি চাই এবং এক্ষুনি তা কিনে ডাইং ক্লিনিংএর দোকানে দিয়ে আর্জেন্ট ধুইয়ে আনতে হবে।

কথাটা সে পাড়ল গিয়ে বাবার কাছে, কিন্তু টিপ্পনি কাটতে এল দাদা—একেবারে কোরা শাড়ি কিনতে হবে তোকে কে বললে? নিয়ে তো যাবি কাচিয়ে, তোদের হেডমিস্ট্রেস বুঝবে কী করে যে পুরোনো না আনকোরা? যেমন তোর বুদ্ধি, কী শুনতে কী শুনিস তার ঠিক নেই।

মিনু রেগে লাল হয়ে বললে, না, আমার নতুন শাড়ি চাই!

তুমি কেন সব তাতে সর্দারি করতে আসো? তুমি মেয়ে-ইস্কুলের জান কী?

দাদা বললে, জানি, মেয়েগুলো হচ্ছে বোকা—যেমন খুশি তাদের বাঁদর-নাচ করানো যায়।—নতুন শাড়ি কাচো, তারপর রঙে ছুপিয়ে নাচো। দাদা একেবারে হেসে চৌচির।

ছলছল চোখে মিনু বাবার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করল। বাবা তাকে উলটে ধমকে উঠলেন, এই মেয়েটার ফ্যাশনের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম! দাঁড়া, কালই আমি তোর নাম কাটিয়ে আনছি!

ধমকের ধাক্কায় মিনু নাকে-মুখে কেঁদে উঠল, আর অমনি দাদা ধুয়ো ধরল—নতুন শাড়ি কাচো, তারপর রঙে ছুপিয়ে নাচো। নাচতে যদি না পারো তো আঁজলা ভরে হাঁচো।

ফল হল এই, মিনুর আর পার্ট করা হল না। দাদার জন্যে সেদিনও একটা ওপন-ব্রেস্ট কোট এসেছে, আর তার বেলায় একখানা শাড়ির জন্যে বাবার ব্যাগে পয়সা নেই। দুত্তোর ছাই, এ-বাড়িতে সে আর একদিনও থাকবে না, যেদিকে চোখ যায় সটান বেরিয়ে পড়বে। তার জন্যে যখন কারু মায়া নেই, তখন তাদের জন্যে তার দুঃখ করতে ভারি বয়ে গেছে।

আজ রবিবার, বিকেল পাঁচটায় তাদের প্লে। নাচের কতকগুলি কায়দা সে মুখস্থ করে রেখেছিল, কিছুই তার দেখানো হল না—বাড়িতে বসে থেকে মুখ বুজে এই লজ্জা সে সইবে কী করে? না, আজই সে বেরিয়ে পড়বে—মা-বাবা বুঝুন, মেয়ে হয়েছে বলে নিতান্ত ফ্যালনা নয়। তাকে আর ফিরে আসতে না দেখে দাদারও চোখদুটো একসময় ছলছল করে উঠুক।

কিন্তু কোথায় সে যাবে? দাদা অনেকদিন চাল দিয়ে বেড়িয়েছে যে খালাসি হয়ে নাকি বিলেত চলে যাওয়া যায়—জাহাজে নাকি ছোট-ছোট ছোকরা চাকরের দরকার। কিন্তু সে যে নেহাৎ মেয়ে! হলই বা না-হয় মেয়ে, তার ছেলে সাজতে কতক্ষণ? দাদার সেই সুট পরে

মাথায় টুপি এঁটে বেরিয়ে পড়লেই হল। তার তখনকার চেহারার কথা মনে করতেই মিনু ফুর্তিতে নেচে উঠল। হ্যাঁ, ছেলের পোশাকে বেরিয়ে পড়াই ভাল—চট করে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। এমনি ফ্রক পরে বেরুলে ধরা পড়তে তার বড় রাস্তায়ও যেতে হবে না। মেয়ে হওয়ার কত অসুবিধে! তা হোক, সে যে এই ফাঁকে স্যুট পরতে পাবে এই ঢের।

দাদার ট্রাঙ্কের চাবিটা ঐ পেরেকে লটকানো আছে। ট্রাঙ্ক খুলে মিনু দাদার পামবিচের স্যুটটা বার করলে। কোটটা তার গায়ে বেশ হয়, কিন্তু প্যান্ট?—একলাফে সে দাদার মত অত লম্বা হয় কী করে? কুছ পরোয়া নেই। তার পায়ের ঝুলটা মেপে নিয়ে মিনু প্যান্টের ওপর সরাসরি কাঁচি চালালে—কল চালিয়ে তাতে মুড়ি ভেঙে নিতে কতক্ষণ! দুপুরবেলা মা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন, বাবা কোর্টে, দাদা গেছে বন্ধুর বাড়ি ক্যারম খেলতে। আসুক না একবার ফিরে—মিনু প্যান্ট পরে কোমরে বেল্ট বাঁধতে লাগল—মিনু চলে গেছে বলে দুঃখ না করলেও অন্তত তার স্যুট নেই দেখে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। কেমন মজা!—দাদা তখন কেঁদে খুন, নাইকো কোট প্যান্টালুন।

তারপর জুতো—একটু ঢলঢলে হচ্ছে বটে, তা ন্যাকড়া ঢুকিয়ে মিনু তার পায়ের মাপে জুৎসই করে নিলে। কিন্তু চুল? চুল নিয়ে হল তার ভাবনা। মেয়েদের অনেক ঝঞ্ঝাট। এত রাজ্যের চুল নিয়ে তার কী হবে? কিন্তু নিজের হাতে মানান-সই করে বব্‌ই বা সে করে কী করে? থাক্‌গে ও—কতদিনের চেষ্টায়, কত মাথা ঘসে এই চুল সে এমন ফাঁপিয়েছে ফুলিয়েছে, তা কেটে ফেলবার চিন্তায় তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। থাক্‌গে—রুমাল দিয়ে বেশ আঁট করে বেঁধে তাতে সে টুপি চাপালো। চুলের জন্যে সামান্য বড় টুপিটা দিব্যি খাপে-খাপে বসে গেছে দেখছি!

বাঃ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে মিনু নিজেকে

আর চিনতে পারছে না। 'হ্যালো হাউ ডু ইউ ডু ?' বাঃ, একেবারে খাঁটি সাহেব, খালাসির পোস্ট তার মারে কে ? তারপর কিন্তু পয়সা, না ? মিনু তার সাবানের ফাঁকা বাক্স ঘেঁটে দেখল, মোটে সাড়ে-চার আনা জমেছে সাতদিনে। তাই সই। জুতো মসমসিয়ে মিনু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল—সদর পেরিয়ে—একেবারে রাস্তায়, শিরদাঁড়া খাড়া করে। তারপর গ্যাট-গ্যাট করে চলল মিনু—দুনিয়ায় কারো তোয়াক্কা রাখে না। তবে একটা কথা, কাউকে গুড্-মর্নিং বলে টুপি তোলা চলবে না—তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

বড় রাস্তায় পড়ে মিনু ট্রাম-মোটরের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠল। হ্যাঁ, দাদা একা রাস্তা পেরোতে পারে, সে পারবে না ? আর ঐ তো পাঁচ নম্বরের বাস—ঐ বাসে সে গেল-বছর ন-দিকে আনতে বাবার সঙ্গে হাওড়া গিয়েছিল। আর জাহাজের খালাসি হতে চাও বা খানসামাই হতে চাও—হাওড়া তোমায় যেতেই হবে। অতএব, মিনু হাত তুলে ড্রাইভারকে বললে, বাঁধকে !

হ্যাঁ, বাসের টিকিট সে কাটবে বৈকি, পয়সা তার নিজের কাছেই আছে। টিকিট কেটে মিনু দেখলে পকেটে আর মোটে দুটি আনি। এ দিয়ে সে কোন দূর দেশ জয় করে আসবে না জানে, তবু তার পকেটে আট পয়সা এখন আছে, পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ তাঁদের ভাগ্য-পরীক্ষা করতে একেবারে রিক্ত হাতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে পয়সা নেই বলে পিছিয়ে থাকবে—তেমন ভীরু মেয়ে মিনু নয়।

হাওড়া স্টেশনে নেমে মিনুর মাথা ঘুরে গেল। সেই বিরাট জনতার সমুদ্রে পড়ে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এখন কোথায় সে যায়, কাকে সে ডাকে! ফ্যালফ্যাল করে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বাড়ি ফিরে যাবারও উপায় নেই—পকেটে দু-পয়সা কম। তা ছাড়া এ-পোশাকে এখন বাড়ি ফিরে গেলে দাদা আর তাকে আস্ত রাখবে না, যে-কাঁচি দিয়ে সে তার প্যান্টালুনের পা কেটেছে, সেই কাঁচিতে দাদা তার কান কেটে দেবে নিশ্চয়। না,

বাড়ি ফেরার নাম সে মনেও আনবে না—ঐ বাড়িতে তার কেউ নেই। ভাইয়ের মধ্যে এক ঐ দাদা—তাই তাকে ঘিরেই যত আদর উথলে উঠছে—আর সে হল কিনা মার ষষ্ঠ কন্যা! তার আর-আর বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাই হাতের কাছে মিনুকে পেয়ে তারই ওপর যত ধমক আর হুমকি! না, সে এই অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, সে কক্ষনো বাড়ি ফিরে যাবে না! যা থাকে অদৃষ্টে, সে তার নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবে।

সারি-সারি প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ফটকের সামনে বিস্তর ভিড়। ঐ নম্বরের ট্রেনটাই বোধহয় আগে ছাড়বে। মিনু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দলে পড়ে কখন নিরাপদে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে তার খেয়াল ছিল না—হয়ত পরনে তার সাহেবি পোশাক দেখেই তাকে সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়েছে, কিংবা ঐ বড় দলটার সঙ্গে মিশে যাওয়াতে আলাদা করে তার কাছে কেউ টিকিট চায়নি। মিনু বুক ফুলিয়ে হেঁটে একটা ইণ্টার ক্লাসের কামরায় এসে উঠল। গাড়িতে ভিড় থাকলে কী হবে, এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরাটিকে দেখে সামনের বেঞ্চিতে একটি বুড়ো ভদ্রলোক তাঁর বিছানা গুটিয়ে তাকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিলেন।

ট্রেন তারপর সময় বুঝে ছেড়ে দিল। যাত্রীদের ভাঙা ভাঙা কথাবার্তা শুনে মিনু বুঝতে পারছে গাড়িটা চলেছে কাশী—কিন্তু সেটা যে কত দূরে মিনু তার দুই চোখে কোন কূল পাচ্ছে না। তারপর বেলা যতই গড়িয়ে গিয়ে চারিদিক অন্ধকারে কালি হয়ে উঠতে লাগল ততই তার, বলতে লজ্জা হয়, ভীষণ কান্না পেতে লাগল। জানলার বাইরে চেয়ে মিনু দেখতে পেল, গাছপালা আকাশ মাটি সব তার থেকে অবিশ্রান্ত দূরে সরে যাচ্ছে—সামনে তার আঁকড়ে ধরবার আর কিছু নেই। তাকে না পেয়ে বাড়িতে বাবা মা কেমন দিশেহারা হয়ে উঠেছেন সেই কথা ভাবতেই কান্নায় তার সমস্ত শরীর তোলপাড় করে উঠল। কিন্তু না, কাঁদবে কী! বাবা-মা বুঝুন,

একবার হারিয়ে গেলে তার দাম কেমন এক নিমেষে ছেলের সমান হয়ে ওঠে!

না, এত সহজেই সে মুষড়ে পড়বে না। ঐ ভদ্রলোকদের ল্যাজ ধরে সে কাশী গিয়েই হাজির হবে। যা থাকে অদৃষ্টে, কাশী—কাশীই সই। সেখান থেকে আবার সে নতুন পথ খুঁজে নেবে। বেরিয়ে এসে আবার যদি সে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যেই হাত-পা ছুঁড়তে থাকে তো সবাই তাকে একবাক্যে বলবে—ছুয়ো! একবাক্যে বলবে—মেয়ে! বিপদে পড়ে বিপদকে বশ করতে না পারলে সে আবার একটা মানুষ কী!

কিন্তু আসানসোলে হঠাৎ টিকিট-চেকার উঠতেই মিনুর মুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা হয়ে এল। ত্রস্ত চোখে কামরার চারদিকে সে চাইতে লাগল, কেউ তার হয়ে একখানা হাফ-টিকিট দেখায় কি না। কিন্তু সে-গুড়ে বালি; চেকার শেষকালে তারই কাছে এসে হাত পাতলে—টিকিট?

মিনু চোখ বড়-বড় করে বললে, টিকিটের আমি কী জানি! এইটুকু ছেলের কাছে টিকিট থাকে নাকি?

চেকার বললে, তবে তোমার টিকিট কার কাছে আছে দেখিয়ে দাও।

মিনু বেমালুম তার পাশের বুড়ো ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, কই, আমার হাফ-টিকিটটা দেখান নি?

ভদ্রলোক আঁৎকে উঠলেন, বিঘৎ-খানেক হাঁ করে বললেন, হাফ-টিকিট? ছোঁড়া বলে কী! তোমার টিকিট আমি কোথায় পাব?

মিনু ভড়কে গিয়ে বললে, কোথায় পাবেন তার আমি কী জানি! ছেলেমানুষের টিকিট বড়দের কাছেই থাকে। আমি তো আর নিজে রোজগার করি না!

ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মারমুখো হয়ে বললেন, তোর টিকিট আমার কাছে থাকবে কেন? আমি তোর কে? আমার

সঙ্গে তোকে নিয়ে যাব কোন্ আক্কেলে? তারপর সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, বাপের জন্মেও আমি একে চিনি না। ছোট ছেলে বলে খাতির করে তখন একটু জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলুম বলে এখন একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা চালাতে চাইছে!

গাড়িময় তুমুল সোরগোল পড়ে গেল। চেকার মিনুর আরো সামনে এসে গর্জন করে উঠল—তুমি কোথায় যাবে?

মিনু ঘাড় উঁচিয়ে চেকারের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে, তা আমি কী জানি!

চেকার রুক্ষ গলায় বললে, তবে কে জানে?

সেই বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে ছোট্ট আঙুল বাড়িয়ে মিনু বললে, ও।

ও তোমার কে হয়?

মিনু ঢোক গিলে বললে, ও আমার জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই? ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, ও ম্লেচ্ছ ছেলের আমি জ্যাঠামশাই? পাজিটা বলে কী! আমার নাম কী বল্ দিকি?

মিনু বললে, তা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

ভদ্রলোক রেগে বলে উঠলেন, শুনুন কথা! আমার নাম জানে না, ধাম জানে না,—দিব্যি ভাইপো ফলাচ্ছে! আচ্ছা, তোর বাবার নাম কী? তা তো জানিস!

মিনু স্বচ্ছন্দে বললে, শ্রীমোহিতকুমার বসু।

বসু! ভদ্রলোক গাড়ি ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, আর আমার নাম হচ্ছে শিবপদ সান্যাল। এই দেখুন আমার পৈতে। সুটকেসের ওপর এই দেখুন আমার নাম পেস্ট করা—**S. P. Sanyal.** আমার দুনিয়ায় কোন ছোট ভাইই নেই—আর আজ কিনা আমি হঠাৎ জ্যাঠামশাই হয়ে গেলুম! সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে আবার তিনি হাঁক পাড়লেন—এ ছেলে কার সঙ্গে এসেছে?

কার সঙ্গে আবার। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, এ গাড়িতে কেউ এর অভিভাবক নেই মশাই।

চেকার মিনুর সামনে হাত নেড়ে ফের গর্জন করে উঠল, বল তোমার টিকিট কোথায়?

ততক্ষণে মিনুর চোখে জল এসে গেছে। লোকগুলি কী নিষ্ঠুর—অসহায় একটা ছেলের বিপদে কেউ এগিয়ে বুক দিয়ে সাহায্য করতে আসছে না। কয়েকটা তো মোটে টাকা—সে বড় হয়ে নিশ্চয় সেই ঋণ শোধ করে দিত। এতটুকু কারু মায়া নেই। মিনু উঠে দাঁড়িয়ে কোণের আরেকটি ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বললে, আপনি আমার টিকিটটা দয়া করে কিনে দিন না। আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আমিও না-হয় যাব।

ও বাবা! কী সর্বনাশ! সেই কোণের ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, কেন, আমি কেন তোমার টিকিট কাটতে যাব? আমি কী দোষ করলাম! জ্যাঠামশাই ছেড়ে এবার মামা পাকড়ালে নাকি?

চেকার চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল: এ তো দেখছি ভারি দুঁদে ছেলে!

ভদ্রলোক দুজন সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, জোচ্চোর, জোচ্চোর—এতটুকু বয়েস থেকেই জোচ্চুরিতে হাত পাকাচ্ছে। ভীষণ ধড়িবাজ, পাকা পকেটমার!

চেকার ফের হুঙ্কার দিল—শিগগির তোমার লোক দেখিয়ে দাও! নইলে এখানেই নামিয়ে দেব বলছি!

ততক্ষণে মিনুর কান্না এসে গেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, ওদের ভেতর থেকে কেউ রাজি না হলে আমি লোক পাব কোত্থেকে? আচ্ছা দাঁড়ান—একটা কথা মনে হতেই মিনুর মনে সাহস এল। বললে, আমার সঙ্গে আসুন দেখি অন্য কামরায় লোক পাই কি না। বলে সুড়ুৎ করে দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

পালালো, পালালো! ধর ঐ প্যাণ্টালুন-পরা ছোঁড়াকে—বিনা-টিকিটে ট্র্যাভল করছিল, ধর, ধর, ওকে! বলে চেকার তাকে তাড়া করলে।

মিনু মোটেই পালাচ্ছিল না। সত্যিই সে প্ল্যাটফর্ম ধরে দৌড়ে গাড়িতে চেনা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ পেছনে একটা সোরগোল শুনে চমকে সে চেয়ে দেখল, ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

ভয়-পাওয়া খরগোসের মত মিনু ভাসা-ভাসা চোখে ট্রেনের চলে-যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। ততক্ষণে চেকার তার ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধরেছে। দাঁতমুখ খিচিয়ে সে বললে, এইটুকু বয়েসেই যে পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছ দেখছি!—স্যুট পরে ভেবেছ আমার চোখে ধুলো দেবে? এখুনি পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করে দিচ্ছি—পাঁচটি ঘা বেত তো হোক!

দেখতে-দেখতে তাদের ঘিরে ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। মিনু ভাঙা গলায় বললে, আরো কতক্ষণ গাড়ি দাঁড় করালেন না কেন, আমি ঠিক টিকিটের পয়সা এনে দিতুম!

পয়সা এনে দিতে! পয়সা তোমাকে দেওয়াচ্ছি! চেকার তাকে হিঁচড়ে টানতে লাগল। মিনু বললে, বা রে, হাত ছাড়ো। লাগে না আমার!

জোচ্চুরি করে রেল কোম্পানিকে ঠকিয়ে পিটটান দিচ্ছিলে—তার আবার লাগবে কী শুনি? না, চলো না—তোমাকে কোলে বসিয়ে দুধ-ভাত খাওয়াচ্ছি!—বলে, চেকার তার মাথা বাড়িয়ে বিশাল একটা চড় মারল।

মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। চড় খেয়ে মিনুর মাথার টুপিটা রুমাল-সুদ্ধু ছিটকে উড়ে পড়ল, আর অমনি তার স্তূপীকৃত চুল পিঠে-বুকে দু-কাঁধে গুচ্ছ হয়ে ছড়িয়ে গেল। টুপি-মাথায় তাকে খানিকটা ঢ্যাঙা দেখাচ্ছিল, মুখটা দেখাচ্ছিল খানিকটা চোয়াড়ে—এখন সে হঠাৎ অনেকটা ছোট হয়ে গেছে, মুখখানি একেবারে

সদ্য-ফোটা জুঁইয়ের মত সুকুমার। কান্না লেগে মুখখানি ভোরবেলাকার বিষণ্ণ তারাটির চেয়েও করুণ দেখাচ্ছে।

সমবেত সবাই বিস্ময়ে শব্দ করে উঠল—একী! এ যে দেখছি মেয়ে! ছোট্ট একটি খুকি! এই ছদ্মবেশে ও এল কোত্থেকে?

তারপর তার ওপর শুরু হল কত প্রশ্ন, অতল সান্ত্বনা, অঢেল আদর।

কিচ্ছু তোমার ভয় নেই, খুকি। আমি থাকতে কেউ তোমাকে কিচ্ছু বলতে পারবে না। তোমাকে ছেড়ে দেব। তোমার আবার টিকিট লাগবে না হাতি! পুলিশের সাধ্য কী তোমার গায়ে হাত তোলে? তুমি বল, কোত্থেকে তুমি এলে—কেন এলে—কার সঙ্গে এলে? কান্না কিসের? আমি তোমাকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দেব। চল আমার সঙ্গে ঐ রিফ্রেশমেন্ট রুমে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না? খেতে-খেতে আমাকে সব বলবে, কেমন? চেক্যার স্নেহে গলে গিয়ে মিনুকে অফুরন্ত আদর করতে লাগল। এবং মিনু তার এই জীবনের নতুন উপন্যাসটুকু তার কাছে আগাগোড়া বিবৃত করলে।

তার পরের ব্যাপারটা খুবই সোজা। ফিরতি-ট্রেনে চেকার নিজে মিনুকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হল—তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। কী মজা, এবারও তার পয়সা লাগবে না। বাড়ি ফিরে যেতে মিনুর আর এখন দুঃখ নেই। সে বুঝেছে, পৃথিবীতে মেয়ে হওয়ারও সুবিধে কিছু কম নয়—ভাগ্যিস মেয়ে হয়েছিল বলেই সে এমন শুভেলাভে বাড়ি ফিরতে পারছে, তার বদলে দাদা এলে তাকে এতক্ষণ সটান থানায় গিয়ে পচতে হত।

থাকো তোমরা বাড়ির লোক সমস্ত রাত জেগে। কাল সকালের আগে মিনুর তোমরা দেখা পাচ্ছ না। কাল বুঝবে মিনুকে ফিরে পাওয়ার দাম, কাল ভুলবে টুপি আর প্যান্টালুনের শোক। তোমরা রাত ভরে জাগো আর কাঁদো—মিনু দিব্যি সেকেণ্ড ক্লাসে স্টেশনের দিককার লোয়ার বার্থে শুয়ে আরো বড় হবার স্বপ্ন দেখুক।

বডি-গার্ডের বিপদ

হনুমানকে তোমরা যতই ঠাট্টা কর না কেন, অনেকে তাকে দেবতা বলে পুজো করে। দিল্লিতে তার নামে রাস্তা পর্যন্ত আছে।

কলকাতা থেকে সতু মার সঙ্গে আগ্রা হয়ে দিল্লিতে তার দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। পুজোর ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল, সতুকে আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে পড়ার ঘরের টেবিল ঝাড়তে হবে। সতুর মুখ ম্লান। এ বছর প্রয়াগে কুম্ভমেলা : মা তাই মেয়ের কাছে দিন-দশেক থেকে মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যেখানে এসে মিশেছে সেই এলাহাবাদে এসে কুটির বাঁধবেন। কলকাতা থেকে সতুদের নিয়ে এসেছিলেন তার জামাইবাবু। কিন্তু বিশেষ একটা কাজে তিনি এখন লাহোরে ; তাই সতুকে কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। মুস্কিল হয়েছে।

সতু বললে, কী হবে ছাই কলকাতায় ফিরে! কাজের মধ্যে তো দুশো বার করে বইগুলোতে মলাট লাগানো আর পাতায় পাতায় জলছবি তোলা—খালি গৌ গাবৌ গাবঃ করতে-করতে সত্যিই গোরু হয়ে যাব, মা। তার চেয়ে এখানেই থাকি, খাই দাই মোটা হই। আর দিল্লি ফোর্টের দেওয়ানি খাসএ বসে শাজাহানের মত বলি, —যদি স্বর্গ বলে কোথাও কিছু থাকে তো এইখানে, এইখানে, এইখানে!

মা ধমক দিয়ে উঠলেন, সামনে তোমার অ্যানুয়েল, সতু। ফার্স্ট হয়ে ওঠা চাই এবার, ফার্স্ট হতে পারলে তোমাকে একটা মোটর-বাইক কিনে দেব।

সতু হেসে বললে, মোটর-বাইক কিনে দিলেও কলকাতার রাস্তায় তুমি আমাকে চড়তে দেবে না। তার চেয়ে আগেই কিনে

দাও না, একবার ফাঁকা সিধে পৃথ্বিরাজ রোড দিয়ে কুতুব বেড়িয়ে আসি—পরে নাহয় ফার্স্ট হওয়া যাবে।

খবর পাওয়া গেল পাশের বাড়ির দুটি যুবক বন্ধু শিগগিরই কলকাতা যাচ্ছেন; শুনে মা অত্যন্ত খুশি হয়ে এদের সঙ্গে সতুকে ভিড়িয়ে দিতে চাইলেন। ব্যাপার বুঝে সতু একেবারে বেঁকে দাঁড়ালো, বললে, ওরা বুঝি আমার অভিভাবক? তুমি আমাকে কী ভাবো বল দিকি? তোমার কাছে চিরকাল বালক থাকলেও অন্যের কাছে আমি নাবালক বনতে পারব না। যেতে হলে আমি একাই যাব, কারো ল্যাংবোট হয়ে যাব না কখনো। ঈশ্বরের খেয়ালে একটু পরে জন্মেছি বলে এ অপমান আমি সইব না।

মা বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে একলা ছেড়ে দিই, আর তোমাকে ফেলে গাড়ি ছেড়ে দিক আর-কি! আসবার সময় মোগলসরাই ইস্টিশানে নেমে ছেলে গেলেন ইঞ্জিন দেখতে—গাড়ি প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে, ছেলের দেখাই নেই। কত খোঁজ, কত চেঁচামেচি—মনে নেই?

সতু বললে, কিন্তু গাড়িতে টান পড়বার মুহূর্তেই পাদানিতে উঠে দরজা ঠেলে যে তোমার গাড়িতে উঠে এল তাকে তুমি ভুলে গেছ? পেছন থেকে গার্ড সবুজ বাতি দেখালে যে গাড়ির গদিতে চেপে বসতে হয়, অন্তত তা আমি শিখেছি। আর, বিপদকে তুমি ভয় করছ মা? বিপদ যদি আসবার হয়, তোমার কোলে বসে থাকলেও আসবে এই ছাদ ফুঁড়ে দেওয়াল ভেঙে—মেঘ না থাকলেও বজ্র পড়ে শুনেছি। লক্ষ বডি-গার্ড নিয়ে বেরুলেও ট্রেনে-ট্রেনে ধাক্কা লেগে ছাতু হয়ে যেতে পারি। সামান্য কলকাতায় যাব—এক গাড়িতে, ঘুমিয়ে—ওঠা-নামা নেই—তাতেই আমাকে একলা ছেড়ে দিতে ভয়ে তোমার মুখ শুকোচ্ছে; তবু তো আমার মনের কথাটা তোমাকে আজও বলিনি। ম্যাট্রিকটা দিয়েই তো আমি পৃথিবী-ভ্রমণে বেরুব। বিমল মুখার্জী তো তবু একটা সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে

—আমি একা পায়ে হেঁটেই যাত্রা করব দেখো। না মা, আমার সঙ্গে চাকর-দারোয়ানের দরকার হবে না।

মা সতুর এইসব কথায় কান দিলেন না। পাশের বাড়ি থেকে ভবেশবাবু ও জিতেনবাবুকে ডেকে পাঠালেন—ভদ্রলোকদুটির সঙ্গে এ বাড়ির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁরা বললেন, স্বচ্ছন্দে ; সতুকে আমরা যত্ন করে নিয়ে যাব—পথে ওর কোন কষ্ট হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ট্যাক্সি করে ওকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আপনাকে টেলি করব'খন।

মা নিশ্চিন্ত হলেন বটে, কিন্তু সতু রাগে অপমানে গুম হয়ে রইল। পুলিশ যেমন কোমরে দড়ি বেঁধে চোর ধরে নিয়ে যায় তেমনি করে ওকে কেউ নজরবন্দী করে রেখে স্কুলের হাজতে পুরে দিয়ে আসবে—পরাধীনতার এ অপমান ও সইবে কী করে ? কেন, ও কি সকালবেলা ছাদে উঠে মুগুর ভাঁজে না ? ছোলা ভিজিয়ে খায় না, ও কি সাহেব দেখলে ভয় পায় ? গ্রামার ঠিক হয় না বলে ওর জিভে ইংরিজি আটকায় ? মোটে তো নশো মাইল, তার জন্যেই মার এত ভয়, আর ও যে কত কোটি কোটি মাইল পেরিয়ে ঠিক পথ চিনে মার কোলটিতেই এসে জন্ম নিয়েছে, সে খবর বুঝি মা রাখেন না ? মা নাহয় মেয়েমানুষ, চাঁদের আলোয় কলাপাতা দেখে ভূত ঠাওরান ; কিন্তু বাবা একজন জলজ্যান্ত সবজজ হয়েও কলকাতা থেকে লিখে পাঠালেন সতুকে পৌঁছে দেবার জন্যে লোক জুটেছে বলে নিশ্চিন্ত হলাম ! আশ্চর্য ! সতু একেবারে অসহায় ?

যাবার দিন এল। টাঙায় করে ভবেশবাবু সতুকে উঠিয়ে নিতে এলেন। সতুর মুখে কথা নেই, চুপিচুপি টাঙায় এসে উঠে বসল। মা ভবেশবাবুদের আর-একপ্রস্থ উপদেশ দিতে শুরু করলেন —ওকে একটু চোখে-চোখে রাখবেন দয়া করে,—ভারি বেয়াড়া ছেলে কিন্তু, ভারি একগুঁয়ে।—জানলা দিয়ে মুখ বের করে থেকো না সতু, খবরদার !

ভবেশবাবু মাতব্বরি করে বললেন, আমরা থাকতে ওর কোন ভয় নেই। ছেলেমানুষ, গল্প করে ওকে আমরা ঘুম পাড়িয়ে রাখব।

হঠাৎ সতু ক্ষেপে গিয়ে তার দুটো হাত ভবেশবাবুর মুখের সামনে তুলে ধরে বললে, এই দেখুন আমার দু-হাতে দশটা আঙুল আছে। গুনে নিন। কলকাতায় পৌঁছে বাবাকে ফের বুঝিয়ে দিতে হবে। চোখের পলকগুলো গুনে নিন, একটাও যেন খোয়া না যায়—সাবধান!

টাকা পয়সা মা ভবেশবাবুর হাতেই দিয়েছেন,—অতএব টিকিটের মালিক সতু নয়। সতু শুধু একটা অনড় বোচকা মাত্র—ওকে অনায়াসেই ব্রেকএ দেওয়া চলে। কিন্তু ওর প্রাণ উড়ন্ত সিন্ধু-শকুনের মত সমুদ্রের লোনা জলে গা ডুবিয়ে সুদূর আকাশে পাখার ঝাপটা দিতে দিতে বেরিয়ে পড়তে চায়।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে কেউ আর গাড়িতে উঠেনি; ছেলেমানুষ বলে সতুকে মাঝের বার্থটা দিয়ে দুই বন্ধু পাশের দুটো অধিকার করে এতক্ষণ পরে মোজা ও গলায় কম্ফর্টার চাপাচ্ছেন। এরই মধ্যে পশ্চিমে শীত পড়ে গিয়েছে কিনা! ভবেশবাবু সতুকে বললেন, Monkey Capটা পর এবার।

সতু চটে শুধু বললে, টুপি পরবার সুবিধে না দিয়েও ভগবান অনেক মানুষকেই বাঁদর সাজিয়েছেন—কী করা যায় বলুন!

গাড়িতে উঠে অবধি ভদ্রলোকদুটি সতুর তত্ত্বাবধানে লেগে গেছেন—এক্ষুনি ঘুমুবে কি না, মা খাবার দিয়েছেন তাই খাবে, না, রেস্টুরেণ্ট কারএ এঁদের সঙ্গে গিয়ে রাইস-কারি খাবে; বাড়িতে মার জন্যে মন-কেমন করছে কি না; কুতুব মিনারে উঠতে কবার তাকে জিরুতে হয়েছিল—যত সব বাজে কথা! সতুর সঙ্গে কথা কইবার আর যেন বিষয় নেই। সামান্য ভিস্তিওয়ালার ছেলে হয়ে হাবিবুল্লা যে সমস্ত আফগানিস্থান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল—বেঁচে থাকলে যে

একটা বংশ স্থাপন করে যেতে পারত; ভিক্ষুক থেকে মুসোলিনি যে আজ সমস্ত ইটালিকে পায়ের গোড়ালির তলায় চেপে রেখেছে, বিরাট অজগর সাপের মত বিশাল ভারতবর্ষ যে আজ ফণা তুলেছে— সতু যেন এইসব প্রসঙ্গের উপযুক্ত নয়। সতু যেন ঠিকানা-লেখা বকলস-দেওয়া একটা পোষা কুকুর—সম্প্রতি কান-ঢাকা টুপি মাথায় দিয়ে হাঁ করে তাকে গাড়ির বাতি দেখতে হবে।

ভদ্রলোকদুটি যদি একসঙ্গেই রেস্টুরেণ্ট-কারএ গিয়ে ঢোকেন তাহলে সতুকে পাহারা দেবার লোক থাকে না,—অগত্যা একজন করে যাওয়া ঠিক হল। বিস্কুটের টিনে ভরে মা সতুকে যেসব লুচি ও লাড্ডু দিয়েছেন তাই ও সাবাড় করুক। ছি ছি—এ অপমান সতু সইবে কী করে? এক ঘণ্টার জন্যেও ওকে একলা রাখতে ওঁদের এত ভয়, এত অবিশ্বাস! নাঃ, এর দস্তুরমত প্রতিশোধ নেওয়া চাই!

আগ্রা থেকে গাড়ি ছেড়েছে। আকাশ পিচের মত অন্ধকার, মেঘ করে আছে বলে তারা দেখা যাচ্ছে না। ভবেশবাবু বললেন, তাজমহল দেখেছ? কেমন? খুব চমৎকার না?

এতক্ষণে কথা বলবার মত একটা বিষয় পাওয়া গেছে। সতু ঠোঁট উলটে বললে, ছাই! এর চেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঢের বড়, ঢের সুন্দর! ইতিহাসে পড়েছি তাজমহল বানাবার সময় দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল—অত টাকা অমন অপব্যয় না করে বেচারাদের দুঃখ দূর করলে কাজ হত।

ভবেশবাবু বললেন, ওদের দুঃখ দূর হলেও একদিন ওরা নিশ্চয়ই মরত। কেউ ওদের মনে করে রাখত না। কিন্তু তিনশো বছর পরেও তাজমহল বেঁচে আছে, চিরকাল থাকবে। সাজাহানের এ একটা অমর কীর্তি না?

সতু ফের বললে, ছাই! মমতাজ দয়া করে আগে মরেছিল বলেই তো শাজাহান তাজমহল গড়বার সুযোগ পেলে। বাহবা যদি দিতে

হয় তবে শাজাহানকে নয়, মমতাজকে। শাজাহান আগে মরলে কী হত? তাজমহল তো হতই না, মাঝে থেকে বেচারি মমতাজ বিধবা হত।

ভবেশবাবু বললেন, বেশ কম্বল মুড়ি দিয়ে এবার ঘুমিয়ে পড় সতু।

সতু বললে, এত সকালে আমি ঘুমুই না। বলে একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু ভবেশবাবুদের কথাই বহাল হল। তাঁরা গাড়ির আলোছুটো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন, সতুকেও শুতে বললেন। সতুর যদি বেশি শীত করে তবে ভবেশবাবুর বালাপোষটাও নিতে পারে। ঢের হয়েছে, সতুকে আর আপ্যায়িত করতে হবে না! এত মোড়লি সতু সইবে না!

গাড়ি সাঁ সাঁ করে ছুটেছে। শূন্যে চারিদিকে জমাট অন্ধকার, দু-পাশের মাঠগুলিকে চেনা যায় না। যেন অন্ধকারের অসীম সমুদ্র! সতু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল—আলো জ্বালালো না। ট্রেনে এখন নিশ্চয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—খালি ও ঘুমোয়নি। ওর মনে হচ্ছিল, এই পৃথিবীও তো এমনি বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে! যদি এমন হয়, এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে খালি সতুই একলা জেগে আছে—আর চারদিকে ভারি পাথরের মত এমনি গাঢ় অন্ধকার—বোবা, অনড়, অসাড়,—তাহলে কেমন হয়? এ প্রকাণ্ড পৃথিবীতে একাকী সতু—ঘর নেই সঙ্গী নেই পথ নেই—আর ওপরে নির্বাক আকাশ—কেমন হয় তাহলে? কোথায় যাবে সে? সে কি একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমি, না, সে একটা উত্তাল ফেনিল সমুদ্র? সেখানেও কি রাত্রি আসে, দিন হয়, বর্ষা নামে, বসন্ত হাসে?—সেখানেও কি মা আছে? আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য স্নেহময় বাহু আছে? সতুর দস্তুরমত ভয় করতে লাগল, নাড়ী টিপে ও হাতের তালুর ওপর নিশ্বাসের তাপ অনুভব করে নিশ্চিন্ত হল যে ও বেঁচে আছে। সত্যিই, রাতের

আকাশের মুখোমুখি তাকালে ভয় করে,—এই অন্ধকার আবার ভোরের আলোয় ভেসে যাবে ভেবে সতু আশ্বস্ত হয়। কিন্তু কে জানে, কাল যদি ভোর না হয়! যদি এই অন্ধকার আর না সরে, যদি সূর্য অন্ধ হয়ে যায়! মানুষের চোখে তো এত আলো নেই যে পথ চিনে নেবে! সব মানুষ তখন অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে—সে ভাবা যায় না! সতুর দম আটকে আসছে। আচ্ছা, ভবেশবাবুরা যে অমন নিঃশব্দে পড়ে আছেন—বেঁচে আছেন তো? হাওড়ায় গাড়ি পৌঁছলেও ওঁরা যদি আর না ওঠেন? আচ্ছা, গাড়িটা যদি পথ ভুলে সোজা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে হাজির হয়? তাহলে সতু কী করে? সতু আস্তে-আস্তে ভবেশবাবুর নাকের ওপর হাত রাখল। সত্যিই নিশ্বাস নিচ্ছেন বলে মনে তো হচ্ছে না! বিষ খাইয়ে অজ্ঞান করেছে বলে যদি সতুকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে? বিচারে যদি ওর ফাঁসি হয়?

নাকের ডগায় সুড়সুড়ি পেয়ে ভবেশবাবু 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন—আধো ঘুমে জিতেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—'পাকড়ো', 'পাকড়ো!' চলন্ত ট্রেনে চুরির কথা শুনে ভবেশবাবুরা এত ভীত হয়ে ছিলেন যে এবার বিনা বাধায় একেবারে শিকল টেনে দিলেন। আলো পর্যন্ত জ্বালা হল না। সতু ব্যাপারটা বুঝে একটুও না ঘাবড়ে গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে ভবেশবাবুর ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভবেশবাবু সতুর হাত চেপে ধরলেন, জিতেনবাবু দিলেন আলোর সুইচ টিপে।

ভবেশবাবু বললেন, আরে, তুমি? তুমি আমার কোট ফেলে দিলে?

গাড়ির বেগ তখন কমে এসেছে। জিতেনবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, তোমাকে এবার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব! জানো, কোটের পকেটে টিকিট ছিল?

সতু মজা বুঝে বললে, কোটটা পাওয়া যাবে'খন। গাড়ি দাঁড়ালে

মিছিমিছি আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে না। খুব বীরত্ব দেখিয়েছেন যাহোক!

কোটটা ফিরে পাওয়া গেল—চোর আর ধরা পড়ল না। ভবেশবাবুরাও রেহাই পেলেন। কিন্তু এলাহাবাদে ট্রেন থামতেই টের পেলেন, গাড়িতে সতু নেই। খোঁজ খোঁজ, কোথায় সতু! গাড়ি যে আবার চলতে শুরু করেছে, কী হবে! আবার শিকল টেনে দেবেন নাকি! ছেলেটাকে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি! ছেলেটার ভালমন্দ যদি কিছু হয় তাহলে অনুতাপের আর শেষ থাকবে না। ভবেশবাবু ভেবেছিলেন ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ওর বাপের কাছে একটা চাকরির উমেদারি করবেন। চাকরি তো দূরের কথা, এখন উলটে তাঁকেই জেলে যেতে হয় কি না কে জানে! জিতেনবাবু বললেন, ঐ ছেলে যাক যেথা খুশি! কথার অবাধ্য হলে আমরা কী করব? এরকম জানলে কে ওর দায়িত্ব নিত!

পরের বড় স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই দেখা গেল, একটা টিকিট-চেকার 'ভবেশ, ভবেশ' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে এদিকে আসছে। ভবেশবাবু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, এই যে আমি। কী বলুন তো?

টিকিট-চেকার কামরার কাছে এসে বললে, ও! এই যে আপনারা দুজন আছেন। আপনারাই কি মহারাজকুমার সতুর বডি-গার্ড?

ভবেশবাবুরা পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে বললেন, তার মানে? কোথায় সতুবাবু?

চেকার বললে, তিনি হোটেলে বসে এখন ছোট-হাজরি খাচ্ছেন। তাঁর টিকিটটা আপনাদের কাছে আছে? তাঁকে দিয়ে আসুন গে—

ভবেশবাবু বললেন, তাঁকে পাওয়া গেছে তাহলে? কোন্ প্ল্যাটফর্মে হোটেল মশাই? বলে ভবেশবাবু টিকিটটার জন্য পকেট হাতড়াতে লাগলেন। পকেটে টিকিট নেই।

ভবেশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে টিকিট-চেকারও হোটেলের মুখে ছুট দিল।

হোটেলে সতু নেই অবিশ্যি। সতু তখন আরেকটা গাড়িতে চড়ে পড়েছে। গাড়িটা ছাড়তেই সতু কামরার জানলা থেকে হেঁকে উঠল—এই যে ভবেশবাবু। টিকিট আমার কাছেই আছে দেখছি।

ভবেশবাবু হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন, এ গাড়ি চড়ে কোথায় যাচ্ছ?

সতু বললে, কোথায় যাচ্ছি জানি না—তবে, একা যাচ্ছি। আমার জন্যে ভয় করবেন না ম্যানেজার মশাই, আমার জিনিসগুলি বাবাকে পৌঁছে দেবেন দয়া করে।

ভবেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চেকার বললে, এই গাড়িও কলকাতায়ই যাবে, তবে, এক্সপ্রেসের দশ ঘণ্টা পরে।

অগত্যা, কী আর করা যাবে! হাওড়ায় গিয়ে ছেলেটার জন্যে দশ ঘণ্টা বসে থাকতে হবে আর-কি।

জিতেনবাবু বললেন, যাক ও ছেলে চুলোয়! ও খোঁজে আমাদের দরকার কী?

ভবেশবাবু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, তুই তার কী বুঝবি গাধা? চাকরির জন্যে এ-পর্যন্ত অনেক মেহনত করতে হয়েছে—এ তো হাওড়া স্টেশনে দশ ঘণ্টা বসে থাকা শুধু। ছেলেটা এখন শুভেলাভে ফিরতে পারলে হয়! হা ভগবান!

টি-টি-আই টিকিট দেখতে চাইল।

বাসব চলেছে কলকাতায়, একা-একা। এতকাল তার টিকিট আর কেউই দেখিয়ে এসেছে এবং এতকাল সেটা অর্ধকায় ছিল। আজ সে যেমন সাবালক তেমনি টিকিটটাও তার পূর্ণাঙ্গ।

তেজের সঙ্গে পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করল ও তার গহ্বর থেকে খুলে দেখালো টিকিট।

তা তো হল। টি-টি-আই বললে, কিন্তু তোমার কুকুর?

কুকুর! বাসব উঠল চমকে, তার মানে?

কুকুরের মানে জানো না?

কুকুর কেন, গোরু-গাধার মানেও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু এখানে আমার কুকুর এল কোত্থেকে? বাসব হাঁপিয়ে উঠল।

কোত্থেকে এল তা আমার জানবার কথা নয়। টিকিট ইনস্পেকটর বললে, কুকুরের টিকিট লাগবে।

কুকুরের টিকিট! আর ইউ ম্যাড? বাসব উত্তেজিত হয়ে উঠল, এখানে চারিদিকে তো আমি ভদ্রলোক দেখতে পাচ্ছি। আপনি এখানে কুকুর পেলেন কোথায়?

এই যে আপনার পায়ের কাছে, বেঞ্চির তলায় নাক গুঁজে বসে আছে, এটা কী?

বাসব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। ঝুঁকে পড়ে নিচু হয়ে দেখল—কুকুর, আশ্চর্য সুন্দর, রোমশ, কোমল, ছোট একটা কুকুর। ঠিক তারই সীটের তলায় পুঁটুলি পাকিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। সাগ্রহে ওটাকে টেনে নিলে বাসব, বুকের উপর ঘন করে ধরে আদর করতে লাগল আর জামার গরমে আরাম পেয়ে কুকুরটা লাগল ল্যাজ নাড়তে।

যাত্রী কে-একজন বলে উঠল, দেখে তো মনে হচ্ছে কতদিনের ভাব, অথচ কুকুরের কথা শুনে তো প্রথমে প্রায় মারবার জোগাড়!

বিনয়-লজ্জিত মুখে বাসব বললে, প্রথমে বুঝতেই পারি নি ও এসেছে। দেখুন, আসলে ওকে আমি মোটেই চিনি না, ও কার কুকুর তাও জানতে পারি নি এতদিন। বাঁকিপুরে মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলুম আই-এ দিয়ে, ছিলুম প্রায় মাসখানেক। আমার থাকবার শেষের দিকে ও একদিন কোত্থেকে এসে হাজির আমার নিচেকার শোবার ঘরে। আমার মামাতো ভাইরা কুকুর-বেরাল সম্বন্ধে মোটেই ইন্টারেস্টেড নয়, তারা বড়-বড় জিনিসের দিকে উৎসুক—ইংরিজিতে যাকে বলে স্ট্রাইপস্ বা ডোরা-ডোরা দাগ অর্থাৎ কিনা, বাঘ—বাঘের দিকে তাদের ঝোঁক, বকলস-চেনের বদলে বন্দুক তাদেরকে বেশি টানে। তাই একে দেখে তারা সবাই দূর-দূর করলে। আর আমার মামিমা—

ট্র্যাভলিং টিকিট-ইনস্পেকটর বাধা দিয়ে বললে, তোমার মামিমার গল্প শোনবার সময় আমার নেই। ভাড়াটা দিয়ে দাও।

বাসব সে-কথায় কর্ণপাত করল না। বললে, আমার মামিমা কেঁচো দেখলে কিলবিল করে ওঠেন, আরশুলা দেখলে নিজে উড়তে থাকেন, আর যদি কোনদিন দেখেন ঘরে একটা ব্যাঙ ঢুকেছে, তবে বুঝতেই পারেন, একেবারেই অজ্ঞান। এ পৃথিবী যে আদৌ মানুষের নয়, এ চেতনাই তাঁর হয় নি। সুতরাং বুঝতেই পারেন, ও বাড়িতে এর আশ্রয় মিলল না।

মিলল না তো এত ভাব জমল কোথায়? কে-একজন জিজ্ঞেস করলে।

সেইটেই বলি। বাসব কুকুরটিকে কোলে করে বসল বেঞ্চিতে। বললে, রোজ তাড়িয়ে দিতুম দুটো বিস্কুট খাইয়ে। আবার পরদিন গায়ের ওপর থাবা তুলে দাঁড়িয়ে লিকলিকে জিভে বিস্কুট চাইত। কোথায় থাকে, কোত্থেকে আসে, কোথায় আবার যায়, কিছুই বুঝতে পারতুম না।

বুঝতে চেষ্টা করেছিলে ? কে আরেকজন প্রশ্ন করল।

বহুদিন। কার কুকুর কত লোককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারে নি। আশে-পাশের বাড়িতে নিজে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি, অনেকের অনেক কিছু হারিয়েছে, কিন্তু কুকুর হারায় নি। রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে ওকে অনুসরণ করেছি—কোথায় ও যায়, কিন্তু কতক্ষণ পরে চমকে চেয়ে দেখি ও-ই আমাকে অনুসরণ করছে। পরে ওর থেকে পালাবার জন্যে হয় একটা এক্কা নিয়েছি নয় তো এ-গলি থেকে ও-গলি করে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছি। তবু আবার পরদিন ও এসেছে।

কিন্তু এখন তো আর লুকোতে পারছ না। টি-টি-আই তার হাতের পেন্সিলটা আস্ফালিত করতে-করতে বললে, এখন ভাল ছেলের মত ওর ভাড়াটা দিয়ে দাও।

বাসব ফোঁস করে উঠল—এ আমার কুকুর আপনাকে কে বললে ? কার-না-কাব কুকুর, গাড়িতে উঠে পড়েছে। আমি এর ভাড়া দিতে যাব কেন ? এদের যে-কেউর কাছ থেকে আপনি ভাড়া চাইতে পারেন—আমি একা কী দোষ করলুম ? এর গায়ে কি আমার নাম লেখা দেখতে পাচ্ছেন ?

তা পাচ্ছি না, কারু নামই পাচ্ছি না। কিন্তু তোমারই যদি না হবে তবে গাড়ির এতগুলি লোকের মধ্যে তুমিই একে এত আদর করবে কেন শুনি ?

এই না হলে বুদ্ধি! বাসব হেসে উঠল, আমি যদি আপনার গোঁফসুদ্ধু মুখটাতে এখন একটু হাত বুলিয়ে দিই তাহলেই আপনি আমার হয়ে যাবেন বলতে চান ?

বেশ, আপনারা সবাই শুনলেন, এ-কুকুর ওর নয়। যেহেতু এ বেওয়ারিস জিনিস, সেহেতু এ রেলওয়ের সম্পত্তি। অতএব এটা আমি নেব। বলে টি-টি-আই কুকুরটাকে বাসবের কোল থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিতে গেল।

বাধা দিয়ে বাসব বললে, থামুন মশাই! যে অবোলা প্রাণী এতদূর পথ চিনে আমার পিছনে-পিছনে চলে এসেছে, রেলের কামরাকে পর্যন্ত যে ভয় করে নি, তাকে এত সহজে আপনার হাতে ছেড়ে দেব, আমি অত অকৃতজ্ঞ নই। নিন, কত ভাড়া লাগবে!

ভাড়া নিয়ে টি-টি-আই কক্ষান্তরে চলে গেল এক পাদানি থেকে আরেক পাদানিতে লাফিয়ে।

বাড়িতে পা দিয়েই বাসব ডাক দিল, রুবি, ছাখ্ তোর জন্যে কী এনেছি!

রুবি বাসবের ছোট বোন, ন-বছরের।

বড়জোর পুতুল কি পুঁতি, ফিতে নাহয় ফাৎনা। দাদার দৌড় তো সে জানে, তাই সে তত চঞ্চল হয় নি। কিন্তু সত্যিকারের জীবন্ত একটা কুকুর, একটা পুতুলের মতই হালকা আর সুন্দর, নরম আর নিরীহ! রুবি তো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দুহাতে প্রায় আকাশ ধরে ফেলল!

দাদা, একে তুমি পেলে কোথায়?

ট্রেনে। বলে বিস্তারিত কাহিনী বললে।

বাঃ! এটা তাহলে আমাদের?

অনেক পয়সা গুনগার দিয়ে তবে এটাকে উদ্ধার করা গেছে। নইলে এতক্ষণে ও কোথায়!

উঃ! সে কথাটা রুবি ভাবতেও পারে না।

ভাববার আর দরকার নেই, কেননা বিশপ, ওরফে বিশু - এই হয়েছে কুকুরের মানবীয় নাম—সব সময় রুবির চোখে-চোখে। শোবার সময় মাথায় তার বালিশ না থাক, বিশু আছে শুয়ে। খাবার সময় তার পেট না ভরুক, লুকিয়ে দুমুঠো চলে গেছে বিশুর জঠরে। শুধু তার ইস্কুলের সময়টা বিশু একা, তখন শিকলে বেঁধে একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়, সেখানেই সে হাই তোলে, সেখানেই সে ঘুমোয়।

যাকে বলে অঞ্চলের নিধি, রুবির তাই হয়েছে বিশু, যদিও রুবি এখনো একখানা শাড়ি পরে নি। শুধু নাওয়ানো খাওয়ানো সাবান মাখানো বুরুশ করাই নয়, সে তাকে এখন হাইজীন শেখায়, শিষ্টাচার শেখায়, টেবল-ম্যানার্স শেখায়, তবুও যখন তার কুকুরত্ব সে ঘোচাতে পারে না, তাকে তখন রুবি সার্কাসের ট্রেনিং দেয়। বিশুকে এখন উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, শুয়ে পড়তে বললে শুয়ে পড়ে। বিশুর কোন্ আওয়াজের কী অর্থ রুবি তা অপ্রতিবাদে বলে দিতে পারে। এবং বড় হয়ে আর কিছু সে করুক আর না করুক, কুকুরের ভাষার সে এক ব্যাকরণ ও অভিধান লিখবে।

তারপর দাদার সঙ্গে সে বিশুকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। এমন কোথাও সে যাবে না যেখানে তার বিশুকে নিয়ে যেতে বাধা বা অসুবিধা আছে। তার পুতুল সম্পর্কে বেয়ান যে ভুতি, তার ঠাকুমা সেদিন তার বিশুকে কুবাক্য বলেছিল বলে সে ভুতির সঙ্গে আড়ি করেছে এবং ভুতির মেয়েকে আজ বারো দিন তার বাপের বাড়ি যেতে দেয় নি। ওবাড়ির অম্‌লি তার মিনির সঙ্গে বিশুর বিয়ের সম্বন্ধ করে পাঠিয়েছিল, রুবি ঘুঙুর-ওলা বকলস আর মখমলের ফতুয়া চাইতেই তো মিনির মার চোখও সাদা হয়ে গেছে। বিশু তার কত ভাল ছেলে, কত উপযুক্ত ছেলে!

বাসব বললে, তুই দেখছি ওকে একেবারে একচেটে করে ফেললি!

নিজের জিনিস নিজের করব না তো কী? রুবি খরখর করে উঠল।

ও তোর জিনিস? তুই ওর ভাড়া দিয়েছিলি?

বাঃ! কী বুদ্ধি! ভাড়া দিয়েছ বলেই তুমি তো ওকে আর কিনে নাও নি! রুবি চোখ ঘুরিয়ে বললে, তাহলে সেদিন শরৎ-দাদা বায়োস্কোপে তোমার টিকিট কাটল, তুমি অমনি শরৎ-দাদার হয়ে গেলে? তবে শরৎ-দাদার বাড়ি না গিয়ে এখানে বসে আছ কেন?

অত কথায় কাজ কী? বাসব বললে,—বেশ তো, এখুনি পরীক্ষা হোক না কেন কার এ কুকুব?

কী পরীক্ষা? গায়ের জোরের? রুবি চোখ টেরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

মোটেই তা নয়, ভালবাসার পরীক্ষা। দুজনে, বাসব আর রুবি, বিশুকে ঘরের মধ্যিখানে রেখে সমান দূরত্ব থেকে দাঁড়িয়ে সমস্বরে ডাকবে, আর যার কাছে ও ছুটে যাবে আগে, প্রমাণ হবে, তারই।

রুবি প্রস্তুত।

বিশু চেয়ারে ঘরের মধ্যিখানে বসে, তার দুদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বাসর আর রুবি; আর দুজনেই প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—আমার কাছে, আমার কাছে!

বিশু বাসবের কাছেই ছুটে গেল।

রুবি পড়ল ঝাঁপিয়ে আর মুহূর্তে ছিনিয়ে নিল বিশুকে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, রাক্ষসের মত গলার জোরে জেতাটা মোটেই জেতা নয়! ও জানে কে ওকে বেশি ভালবাসে। বলে বিশুর ঘাড়ে সে হাত বুলুতে লাগল। আর বাসব লাগল হাসতে।

এ হাসি আর তার থাকল না যখন কয়েকদিন পরে তার নামে আদালতের এক পরোয়ানা এসে হাজির হল যে, সে বাঁকিপুরের এক ভদ্রলোকের কুকুর চুরি করে পালিয়েছে। কুকুরের যা বর্ণনা তাতে বিশু অবিকল খাপ খাচ্ছে। দারোগা তার বিশুকে ধরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, ছেড়ে দিয়ে গেল এই সর্তে যে, শুনানির তারিখে কুকুর-সমেত আদালতে তাকে হাজির হতে হবে।

আদালতে এসে বাসবের চক্ষুস্থির! আর কিছুতে নয়, বিশুকে যে নিজের বলে দাবি করছে তার চেহারা দেখে। হাঁটু-পর্যন্ত-কাপড়-তোলা ফতুয়া-পরা একটা খোট্টা—হয় নিশ্চয় কারুর দারোয়ান, নয় পাইক-বরকন্দাজ। বাসবের সঙ্গে বিশুকে দেখে সে হাউ-হাউ করে উঠল—এই যে আমার কুত্তা! ভাষা শুনে বিশু অবজ্ঞায় একটু হাঁচল।

ডাক পড়ল মোকদ্দমার। ফরিয়াদি চিমনলাল বললে, মামলা সে চালাবে না যদি কুকুর সে ফিরে পায়।

ফিরে সে পাবে, বাসবের উকিল বললে, আগে প্রমাণ করুক ও ফরিয়াদির কুকুর।

ও বলুক, বাসবের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চিমনলালের উকিল বললে, বলুক ও, কুকুর ও পাটনা ইস্টিশানে রেলের কামরায় কুড়িয়ে পায়নি?

প্রতিপক্ষ বললে, তা হয়ত পেয়েছি। কিন্তু তাইতে প্রমাণ হয় না কুকুর চিমনলালের।

ও বলুক, কুকুরের গলায় একটা বাদামি বকলস ছিল না?

বাদামি কি বেগুনি, ছিল একটা বকলস। তাইতেই প্রমাণ হয় না চিমনলাল তার মালিক।

বেশ, ও-ই দেখাতে পারে এ-কুকুর ও কিনেছে?

প্রতিপক্ষ বললে, তা চিমনলাল দেখাবে, যখন আমার বাড়িতে আমারই শিকলে-বাঁধা পোষা কুকুর ছিনিয়ে নেবার জন্যে সে এই মামলা এনেছে।

আমার যদি না হবে তবে আমি এলাম কেন কলকাতায়?

কলকাতায় এসেছেন, জু দেখুন, জাদুঘর দেখুন, দিন বেশ ভালই কাটবে।

কোনই মীমাংসা হয় না। বাসবের দল বুঝলে, কুকুর বোধহয় সত্যিই চিমনলালের; যেরকম অবিকল বর্ণনা দিচ্ছে! ল্যাজের পাশে কোথায় কি একটা কাটা দাগ, সামনের কোন্ পায়ে নখটা ঈষৎ ডোবানো—তবু সাক্ষী-প্রমাণ যখন কিছুই তার নেই, তখন তারা হার মানতে তত রাজি নয়। আর চিমনলাল বোঝে, সে পাটনা থেকে আসুক বা ট্রানস্‌ভাল থেকেই আসুক, 'কুকুর আমার' বললেই আদালত তাতে কর্ণপাত করবে না। আমার বললেই যদি আমার হত তাহলে আর ভাবনা কী!

তারপর দুই পক্ষে একটা রফা হল—এক পক্ষে সত্য, অন্য পক্ষে

স্নেহ। সেটা আর কিছুই নয়, বিশু থাকবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আর তারা দুজন, বাসব আর চিমনলাল, দুই ভিন্নমুখী রাস্তায় দুই দিকে চলে যাবে নিঃশব্দে। কেউ কোন ইসারা করতে পারবে না—আর কুকুর যাকে অনুসরণ করবে সে-ই হবে তার প্রভু।

দু-পক্ষই সম্মত, যখন দু-পক্ষই অন্তরে দুর্বল।

লোকে লোকারণ্য—কাকে কুকুর অনুসরণ করে! কেউ কোন অভিযোগ করতে পারবে না, খাঁটি খেলোয়াড়ের মত হার-জিত মেনে নিতে হবে।

চিমনলাল গেল উত্তরে আর বাসব দক্ষিণে—এবং বিশু অবলীলাক্রমে চিমনলালকেই অনুসরণ করল।

বিশুকে চিমন কোলে তুলে নিল ও বাসবের দিকে এগিয়ে এসে বলল, আপনার সেই বাড়তি রেল-ভাড়াটা কত লেগেছিল যদি জানতে পাই!

বাসব ম্লান গলায় বললে, আর কত লেগেছে জেনে আপনার কাজ নেই। বলে সে চলন্ত একটা ট্রামে উঠে পড়ে মুখ লুকোলো।

বাড়িতে আসতেই রুবি চেঁচিয়ে উঠল—দাদা, বিশু?

বাসব ভারি গলায় বললে, যার কুকুর সে নিয়ে গেছে।

যার কুকুর মানে? রুবি রুখে উঠল: কুকুর তো আমার!

বিশু তা স্বীকার করলে না। বলে সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে।

রুবি কেঁদে ফেলল। ছলছলে গলায় বললে, তাই যখন কথা হল, তখন আমাকে তুমি খবর পাঠালে না কেন? ঠিক ও আমার পিছু নিত, আমার ছাড়া কখনো ও কারুর সঙ্গে যেত না। আমাকে তুমি ডাকলে না কেন?

বাসব বললে, সেদিন তো তুই আমার কাছেই হেরে গেলি!

সেদিন তো হেরেছিলুম গলার জোরে! রুবি কান্নায় উথলে উঠল, আজ যখন ভালবাসার জোরের কথা উঠেছিল, আমি ঠিক জিততুম।

ঠিক ওকে ফিরিয়ে আনতুম ঘরে, অমন মুখ কালো করে বাড়ি ফিরতুম না। বলে রুবি কান্নার আবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সব বৃথা—তার বই, তার পুতুল, তার সাজ-গোজ, কিছুরই কোন অর্থ নেই।

সে রাত্রে রুবি একটা স্বপ্ন দেখল। বিশু শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে তীব্র ঊর্ধ্বশ্বাসে। ট্রাম-মোটর লক্ষ্য করছে না। ছুটছে এ-বাড়ি লক্ষ্য করে, রুবির কাছে আসবে বলে। কেবল ছুটছেই। কোন্ পথ দিয়ে যে কোন্ পথ, বুঝতে পারছে না।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে সবাই দেখল, রুবি শুয়ে নেই। মুখ ধুচ্ছে বুঝি—না, নেই কলতলায়। পড়তে বসেছে হয়ত—পড়ার ঘরটা অন্ধকার। কোথায় রুবি? ঘরে, বারান্দায়, আনাচে কানাচে,—কোথায় রুবি।

সবাই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে, যে যার মনে যেখানে-সেখানে। গলির মোড়ে প্রসন্ন-মুদির ঝাঁপ-ফেলা দোকানের সঙ্কীর্ণ রকের ওপর রুবি হাত-পা গুটিয়ে ঘুপটি মেরে বসে আছে। তার বাপকে এদিকে আসতে দেখে রুবি নিচু গলায় বললে, শব্দ করো না বাবা! বিশু অনেক দূর এসে পড়েছে! ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে এই আরেকটু পরেই এদিকে ঢুকে পড়বে! ঠিক বাড়ি চিনে-চিনে ও আসছে আমার কাছে! তোমরা সরে যাও, ওকে ভয় পাইয়ে দিয়ো না!

মেয়ের গলা শুনে রুবির বাবা শ্রীমন্তবাবু আপাদমস্তক শিউরে উঠলেন। যখন তাকে কোলে তুলে নিলেন, দেখলেন তার ভীষণ জ্বর, আর তার শরীর কেমন শিথিল, মুহ্যমান।